পঞ্চম অধ্যায়

প্রবাদে সমাজের আঙ্গিকগত পরিকাঠামো

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যা অন্যান্য প্রাণীকুল থেকে স্বতন্ত্র। নিজ ভাব ও চিন্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই সমাজের সৃষ্টি। এই সমাজ একক ব্যক্তি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন দুই বা ততোধিক মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের পারস্পরিক কথোপকথন। জন সমষ্টি যখন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাকে সমাজ বলে। জনসমষ্টির প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ জীবন ধারাগুলি যখন সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ হয় তখনই তাকে সমাজ বলা হয়। সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় একটি সু-শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে, সমাজের সেই কাঠামোগুলি সু-শৃঙ্খলে আবৃত থাকে। একটি কাঠামো অচল হলে সমাজ বিশৃঙ্খল বা বিকল হয়ে পড়বে। কারণ "সমাজস্থ লোকেদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interelated act of people or Interaction system) দ্বারা যে সু-সংবদ্ধ জটিল ও নিবিড় সম্বন্ধজন সৃষ্টি হয়, তাহাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ সামাজিক কাঠামো (Social Structure) আখ্যা দিয়া থাকেন।"[১] এই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগুলি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কারণ সমাজ হল পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্ত সম্পর্কের আচার-ব্যবস্থা সমূহ যা সু-সংবদ্ধ পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। অপরদিকে প্রবাদ সমাজ জীবনের দর্পণ — সমাজে যা প্রত্যহ ঘটে তাই প্রতিফলিত হয়। প্রবাদ দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। সরস-সংক্ষিপ্ত পরম্পরাগত বাক্য। জীবন্ত মানুষের গভীর উক্তি, সাধারণের সম্পদ। প্রবাদের মধ্যে সমাজের প্রচলিত শিক্ষা, পেশা, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, পরিবার, সামাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভৃতির সাক্ষাৎপাই তা অস্বীকার করা যায় না। প্রবাদ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সমাজের পরিকাঠামোর সাথে সম্পর্ক যুক্ত অভিজ্ঞতার সারমর্ম। প্রবাদ বহুমুখী, মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি আঙ্গিনা স্পর্শ করেছে। শিক্ষা-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ধর্মনৈতিক-সংস্কৃতি ছাড়া সমাজ যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সমাজের প্রত্যেকটি কাঠামোকে নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা চিত্রিত হয়েছে প্রবাদে। বস্তুতঃ সমাজের আঙ্গিকগত পরিকাঠামোয় প্রবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাঁকুড়া জেলার প্রত্যকটি ব্লকের ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রবাদগুলিতে মানব সমাজের বা সামাজিক জীবনধারার আচার-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বন-অনুষ্ঠানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা

হয়েছে। প্রবাদগুলি কখনো প্রত্যক্ষভাবে বিশ্লেষিত অর্থ সরাসরি দেখানো হয়েছে কখনো বা ব্যঞ্জনার্থে দ্ব্যর্থভাষায় পরোক্ষ ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। যথা : "চাঁউড়ি বাঁউড়ি মকর এখ্যান সেখ্যান সাঁই সুঁই / তার পদ্দিন আসবি তুই" প্রবাদটিতে সহজ সরল ভাবেই দেখানো হয়েছে যে বাউরি সম্প্রদায়ের নিকট টানা পাঁচ দিন ধরে "মকর পরব" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরবে সাত দিন আনন্দে কাটানোর পরদিন কাজ-কর্মে (জীবিকা উপার্জন) লিপ্ত হবার কথা বলেছে। তার আগে নৈব নৈব চ। (চাঁউড়ি বাঁউড়ি মকর এখ্যান সেখ্যান টানা পাঁচদিন। সাঁই সুঁই অর্থাৎ আরো দু-দিন রয়ে বসে কাটানো। মোট সাত দিন)। অর্থাৎ প্রবাদটিতে একটি অর্থই সহজ-সরল ভাষায় প্রত্যক্ষ ভাবে দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, "আড়ে নাই অসাড়ে"। বাঁকুড়া জেলার ভাষাভাষী মানুষের কাছে 'আড়ে' শব্দের বিপরীত 'অসাড়' হয়েছে। আড়ে অর্থাৎ চওড়া। প্রবাদটি দ্ব্যর্থ ভাষা বহন করে সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জিনিস বা বস্তুটি দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে নেই। অর্থাৎ অকেজো জিনিস। কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থে কোনো মানুষের চরিত্র সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে। অকর্মন্য ব্যক্তি যার দ্বারা কোনো কাজই সফল হয় না। যার দৈর্ঘ্য নেই আবার প্রস্থও নেই অর্থাৎ গুরুত্বহীন ব্যক্তি। আবার উক্ত প্রবাদটি স্থান বিশেষে একইঅর্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। কোথাও শিক্ষা, কোথাও পেশা বা কোথাও অর্থনৈতিক অবস্থাকে উদ্দেশ্য করে বিশ্লেষিত। পেশা বা জীবিকা উর্পাজনে অসমর্থ হলে বিষ্ণুপুর অধিবাসীরা উক্ত প্রবাদটি বলে থাকে। আবার সোনামুখী ব্লকের মানুষেরা অর্থনৈতিক অসফল ব্যক্তিকে উক্ত প্রবাদটি বলে থাকে। আবার খাতড়া অঞ্চলের মানুষেরা শিক্ষায় অসমর্থ হলে প্রবাদটি বলে থাকে। অর্থাৎ প্রবাদগুলি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একই অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে।

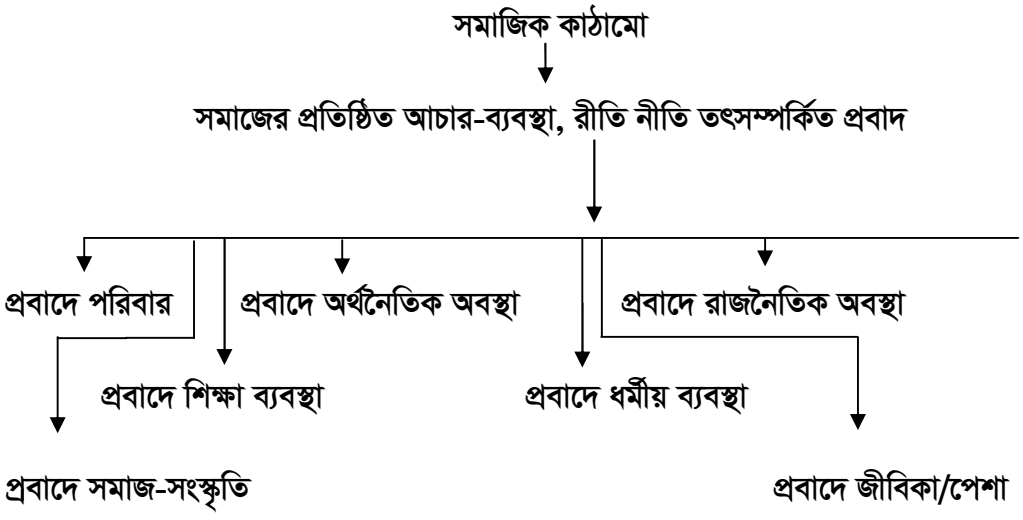

প্রবাদে পরিবারের অবস্থান

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। সামাজিক পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল পরিবার। স্বামী-স্ত্রী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যখন একত্রে বসবাস কবে অথবা মা-বাবা-ভাই-বোন যখন একত্রে একছাদের তলায় বসবাস করে, তখন তাকে পরিবার বলে। একটি পরিবারের সাথে অপর একটি পরিবারের সম্পর্ক সংস্থাপন করে, তখন দুটি পরিবারের মানুষজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পিসি-মাসি, কাকু-কাকিমা, জ্যেঠু-জ্যেঠিমা, ভাইপো-ভাইঝির সাথে সুমিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের মূল্যবোধ অপরিসীম। প্রবাদে সেই মূল্যবোধগুলি ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি-মান-অভিমান-হাসি-কান্নার মধ্যদিয়ে চুল চেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধ, সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ, ভাই-বোনের প্রতি স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার অটুট বন্ধন, প্রবাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। পিতা-মাতা অগ্রজের প্রতি যে ভূমিকা স্বীকৃত তা সন্তানের মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষা আবহমানকাল চলে এসেছে। সন্তানের প্রতি লালন-পালন-পরিচর্চার কথাও প্রবাদে লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, প্রবাদে সমাজ বহির্ভূত জীবনাচরণ যে নিন্দনীয় তার কথা প্রতিবাদী প্রবাদে আমরা শুনতে পাই। মা-মেয়ের সম্পর্ক যে চির আদৃত বা শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক তিক্ততা কখনোও বা শাশুড়ি-জামাই এর সম্পর্ক মজাদার, কখনোও বা কন্যার প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে পিতার গুমরে ওঠা আর্তনাদ শোনা যায় প্রবাদে। কারণ প্রবাদ সমাজের দর্পণ সমাজের অভিজ্ঞতার দর্পণ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

Sl.	ব্লক	গ্রাম ও শহর সংখ্যা	জন সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	নারী সংখ্যা	পুরুষ সংখ্যা
1	শালতোড়া	১৫৭	১৩৫৯৮০	২৮১১৫	৬৬২৪৮	৬৯৭৩২
2	মেজিয়া	৭৫	৮৬১৮৮	১৭৬৫৯	৪১৬১৩	৪৪৫৭৫
3	গঙ্গাজলঘাটি	১৬৫	১৮০৯৭৪	৩৭৮৭৮	৮৭৭২২	৯৩২৫২
4	ছাতনা	২৮৭	১৮৯৭২১২	৩৮৮৩৬	৯২৯১৫	৯৬৭৯৭
5	ইন্দপুর	২২২	১৫৬৫২২	৩১৬৬৮	৭৫৯৬৬	৮০৫৫৬
6	বাঁকুড়া-১	১৫০	১০৭৬৮৫	২১৯১৭	৫২৬০৬	৫৫০৭৯
7	বাঁকুড়া-২	১৫৪	১৪০৮৬৪	২৯৫০২	৬৮৫৬২	৭২৩০২

8	বড়জোড়া	১৯৮	১৭৬২৬৩	৩৮৬৬৪	৮৫৬৩৯	৯০৬২৪
9	সোনামুখী	১৮৬	১৫৮৬৯৭	৩৫০২২	৭৭০৮৭	৮১৬১০
10	পাত্রসায়ের	১৬০	১৮৪০৭০	৪০৬৫৩	৯০৪৫৬	৯৩৬১৪
11	ইন্দাস	১৩১	১৬৯৭৮৩	৩৭৬৫০	৮৩০৮৬	৮৬৬৯৭
12	কোতুলপুর	১৬৯	১৮০২৯২	৩৯১৪৬	৮৮১৭৮	৯২১১৪
13	জয়পুর	১৩৯	১৫৬৯২০	৩৪৪৯১	৭৬৭৮২	৮০১৩৮
14	বিষ্ণুপুর	১৬১	১৫৬৮২২	৩৩৭৯৩	৭৬৮৮১	৭৯৯৪১
15	ওন্দা	২৯১	২৫২৯৮৪	৫৩০০৬	১২৩৭৩৬	১২৯২৪৮
16	তালডাংরা	১৪৫	১৪৭৮৯৩	৩১৩১২	৭২৮৯৪	৭৪৯৯৯
17	সিমলাপাল	২০২	১৩৫৮৩২	২৮৩২৪	৬৬৫১৭	৬৯৩১৫
18	খাতড়া	১৫৩	১০৪৫৯২	২২৫০২	৫০৮৯০	৫৩৭০২
19	হীড়বাঁধ	১২১	৮৩৮৩৪	১৭২৪৯	৪০৯১৭	৪২৯১৭
20	রানিবাঁধ	১৮৬	১১৯০৮৯	২৫৯৫৩	৫৮৭৯৯	৬০২৯০
21	রাইপুর	২০৫	১৬৫০৯৭	৩৫৭৯৬	৮০৯৯০	৮৪১০৭
22	সারেঙ্গা	১৬৬	১০৬৮০৮	২২০২০	৫২৬৪০	৫৪১৬৮

উপরিউক্ত বাঁকুড়ার ২২টি ব্লকের প্রাপ্ত গ্রাম, জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, নারী পুরুষের পরিসংখ্যান তালিকাটি দেওয়া হল। কারণ, ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে গ্রামের মানুষগুলিই বাঁকুড়ার ভাষা সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে।সংগৃহীত প্রবাদগুলি ২২ টি ব্লকের বেশির ভাগ গ্রাম কেন্দ্রিক পরিবারের নারীদের কাছ থেকে পাওয়া। যদিও বাঁকুড়ার মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এবং শহরের থেকে গ্রামের সংখ্যা বেশি। গ্রামে পরিবারের মানুষগুলি মিলেমিশে এক ছাদের তলায় বসবাস করে। বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেছে মেজিয়া ব্লকের ৭৫ টি গ্রামের (৬১৮৮ জনসংখ্যার) মানুষগুলি বাঁকুড়ার সংস্কৃতিটিকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। তাদের মুখে বেশিরভাগ প্রবাদগুলি উচ্চারিত। তাছাড়া ইন্দপুর, ছাতনা অঞ্চলে গ্রামের সংখ্যা যেমন বেশি, তেমনি প্রবাদগুলিও সংগৃহীত হয়েছে সর্বাধিক। বস্তুতঃ দেখা গেছে ২২ টি ব্লকে গ্রামের মানুষগুলির আদব-কায়দা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণগুলি শহরের মানুষের থেকে একেবারে ভিন্ন ধর্মী। গ্রামগুলিতে প্রত্যেকটি পরিবারে টিন বা খড় বা মাটির টালি ঢাকা মাটির বাড়িগুলি লাল মাটির

কাঁচা রাস্তার ধারেই গড়ে উঠেছে। গ্রামের বাড়িগুলি একত্রিত নয় বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। কখনো ৮-১০ টি পরিবার মিলে একটি পাড়ার সৃষ্টি করেছে কখনোও বা কয়েকটি পরিবার মিলে একটি পাড়া তৈরি হয়েছে। পরিবার-পরিজনের সাথে যেমন ঝগড়া তেমনই ভাব। বস্তুতঃ প্রবাদগুলি শহরাঞ্চল বা বাজার থেকে গৃহীত নয় গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলের মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত। শিক্ষা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সংগৃহীত প্রবাদে পরিবারের অবস্থান সম্পর্কে বিবৃত করা হল :

আঁশচ্যে তুমার কালাচাঁন্দ / ঘুরাই ফিরাই মাথা বাইন্দ। (সাবিত্রি হাজরা, বয়স-৫৫, জাতি-তাঁতি, নিরক্ষর, গৃহবধূ, হরিডিহি, পোঃ গুন্নাথ, ব্লক-ইন্দপুর)

সহজ-সরল-অনাড়ম্বর গ্রাম বাংলায় বহুদিনের প্রবাসী স্বামী শ্বশুরবাড়ি অভিমুখী হলে স্ত্রীর কাছে আনন্দনীয়। স্বামীকে বিভিন্ন কৌশলে কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে স্বামীকে আঁকড়ে রাখার জন্য স্ত্রীর রূপ সজ্জারও ত্রুটি নেই। তাই স্বামীর গোচরে প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে, ফিতে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার চুল বাঁধার বা কেশ সজ্জার কথা বলা হয়েছে। গ্রাম-বাংলায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ন্যুনতম মূল্যবোধটিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

এতটুকুন ফুঁকার‍্যে এ্যাঁড়্যা গরু হাঁকার‍্যে / সইতে ল্যারি যাব্য কুথায়। (সাবিত্রি হাজরা, বয়স-৫৫, জাতি-তাঁতি, নিরক্ষর, গৃহবধূ, হরিডিহি, পোঃ গুন্নাথ, ব্লক-ইন্দপুর)

আলোচ্য প্রবাদটি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে। একজন পিতা সন্তানের ভূমিষ্ট হওয়া থেকে কৈশোর কাল পর্যন্ত লালন-পালন-পরিচর্চা করে এসেছে। কিন্তু পুত্র কৈশোর পেরিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতার কাছে মস্তক আবনত করতে চায় না। পিতৃ স্নেহ ভুলে গিয়ে পিতার উপর হাক-ডাক ছাড়ে। পিতার কোন কথায় তার সহ্য হয় না। সন্তানের ব্যবহারে পিতা অসহ্য হয়ে পিতৃদায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক যখন তিক্ততায় পর্যবসিত হয় তখনই পিতার কণ্ঠে বেদনাতুর ভাষায় ভেসে ওঠে উক্ত প্রবাদটি।

শ্বশুর ঘরের বড্ড জ্বালা / চইল্ল্যে বলে খইরখরাট্যা / না চইল্ল্যে বলে খঁড়্যা বউট্যা / চাইল্যে বল্যে ভ্যাবড্যাবাট্যা / না তাকাইল্যে বলে কানা বউট্যা / খাইল্যে বলে পেট মরাট্যা। (ইলা চক্রবর্তী, বয়স- ৬৫, চতুর্থ শ্রেণী, গোয়ালা পাড়া, গ্রাম-মাকড়কোল, পোঃ ওন্দা, ব্লক-ওন্দা)

সংসারের শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও স্বামীর সংসার করতে হবে, না হলে সমাজচ্যুত হবে। তৎকালীন সমাজে বিবাহিত মেয়েকে বাপের বাড়িতে রাখা সঙ্গত নয়। নব বধূকে সব মানিয়ে নিয়েও চুপ থাকতে হয়। তাই সারা জীবন শ্বশুর বাড়িতেই পড়ে থাকতে হয়। শ্বশুর-শাশুড়ির গঞ্জনায় মানসিক নির্যাতিতা অসূর্যম্পশ্যা নারীর জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। তাদের কাছে শ্বশুর বাড়ি হয় যমের বাড়ি সাদৃশ্য।।

তালগাছে তাল ঠুরকি তাঁতুল গাছে কেউয়া / কুন শালারা বইল্যে গেছ্যে / জামাই শালা বোয়া। (নিভা হাজরা, বয়স-৬৫, জাতি-সদগোপ, গৃহবধু, লেখাপড়া নেই, পেশা-চাষবাস, হরিডিহি, পোঃ গুন্নাথ, ব্লক-ইন্দপুর)

উক্ত প্রবাদটিতে সমাজ বহির্ভূত এক ভিন্ন ধর্মী অবৈধ সম্পর্কের কথা ফুটে উঠেছে। তালগাছে তাল ঠুরকি অর্থাৎ শুকিয়ে যাওয়া তাল থাকতেই পারে, তেঁতুল গাছে কেউয়া অর্থাৎ কাক থাকতেই পারে কিন্তু জামাই এর সাথে শুধু কন্যার সম্পর্ক নয়, জামাইয়ের সাথে শাশুড়ির গুপ্ত সম্পর্কের কথা প্রবাদটিতে স্পষ্টভাবে ঘোষিত। তাই শ্বশুর মশাই, জামাইয়ের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করলেও গুপ্ত অবৈধ সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়েছে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের নিকট। 'বোয়া' অর্থাৎ গ্রাম্য গালাগাল বিশেষ (শাশুড়ি জামাইয়ের অবৈধ সম্পর্ক)।

শুসনি শাগ বলে আমি / ডগে চাট্টি পাতা / ননদ ভাজে তুইলত্যে গিয়্যে / করি দুখখু কথ্যা। (জ্যোৎস্না চন্দ, বয়স-৬০,জাতি-সূত্রধর, লেখাপড়া নেই, গৃহবধূ, কেঞ্জাকুড়া, ব্লক-বাঁকুড়া-১)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সর্বদা পদদলিত। অনাদৃতা নারীরা জীবন যন্ত্রণার কথা স্বামী-শাশুড়ি-শ্বশুরকে বলতে পারে না। তাই বন্ধুসুলভ ননদ-ভাজ মিলে গোপনে শাক তুলতে গিয়ে বধূ নির্যাতনের কথা একে অপরকে বলে দুঃখ বিলাপ করে, দুজনের দুঃখ ভাগ করে নেয়। আলোচ্য প্রবাদটিতে প্রবহমান কালের বাঙালি পরিবারের শাকান্ন আহারের কথাও ফুটে উঠেছে।

ঘরের চালা আর শ্বশুর ঘরের শালা / না থাইকল্যে মানাই নাই। (গুপি বাউরী, বয়স-৫৫, পেশা-গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন, পোঃ ঝাঁটিপাহাড়ী, ব্লক-ছাতনা)

তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় 'বিবাহ' হল স্বামী-স্ত্রীর মিলন এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল দুটি পরিবারের মিলন। তাই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে যথাযথ যাচাই করে নেয়। ছেলের বাড়ি (ঘর-বাড়ি) এবং মেয়ের ভাই যে পরিবারে থাকে, সেই পরিবারের সাথেই পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ হয় বা সম্বন্ধ

হয়। কারণ, একজন পিতার কাম্য কন্যা যাতে নিরাপদ স্থানে (বাড়ি-ঘর) বসবাস করতে পারে, অপরদিকে পাত্রপক্ষের কাম্য, পাত্রীর বাড়ির সাথে জামাই এর সু-সম্পর্ক গড়ার জন্য প্রয়োজন একজন শালা অর্থাৎ কন্যার ভাই। আলোচ্য প্রবাদটিতে 'ঘরের চালা' এবং 'শ্বশুর বাড়ির শালার' প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়েছে।

ভাব কইর‍্যে ভাব রাইখলি নাই / ফুইট্যা গেল্য আমার বড়াল ধানের খই। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া)

পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে কলহে লিপ্ত হলে নারীরা উক্ত প্রবাদটি বলে থাকে। 'বড়াল ধান' হল লালচে রঙের একপ্রকার ধানের নাম। সু-সম্পর্ক বাজায় রাখতে গিয়ে সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করলে সম্পর্কে তিক্ততা আসে। সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় যেমন ভাবে বড়াল ধান তপ্ত হয়ে ফুটে খই হয়।

আইস্যে দেইখল্য আমার জ্বর হঁইনছ্যে / সে ক্যান্যে আমার ঘর আঁইসেছ্যে। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া)

নারী দুঃখ ভরা অভিমানে বলেছে, এতদিন সুখের দিনে তার স্বামী ঘরের দোর পার হয়নি। আজ সে অসুস্থ তাই দুঃখের খবর নিতে এসেছে। প্রবাদে স্বামী-সোহাগে বঞ্চিতা এক নারী অপর এক নারীর নিকট ব্যথিত চিত্তে ব্যক্ত করেছে তার অভিমান ভরা জীবন যন্ত্রণার কথা।

তামুক খ্যায়েঁ দাঁত ক্যাল্য / লোকে বলে আছে ভ্যাল্য। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া)

তৎকালীন সমাজে নারীর কাছে অবসর যাপনে বিলাসিত দ্রব্য ছিল তামাক দিয়ে দাঁত মাজা। অর্থনৈতিক অবস্থাপন্ন গৃহিনীরা দীর্ঘদিন তামাক সেবন করার ফলে দাঁতে কালো ছোপ পড়ত। যা সহজেই শনাক্ত করাযেত ধনী বাড়ির গৃহিণীদের। কিন্তু টাকা-কড়ি থাকলেও জীবনে সুখ-শান্তি বিরাজ করত না। বাইরের সকলের চোখে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো দেখালেও সুখী ছিল না। নারী মনের গোপন হাহাকারটি প্রবাদে পরিস্ফুট।

তুর কাপড়ের পাইড় ভ্যাল্য / আইস্যেছিলি তাই দেখ্যা হল্য। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া)

গ্রাম বাংলায় পূজা-পরবের দিনগুলিতে কন্যারা বাপের বাড়ি আসে। সই বা ফুল পাতানো সখীদের সাথে মনের কথা, প্রাণের কথা, বেদনার কথার আর শেষ হয় না। পূজা-পার্বণের দিনগুলিতেই তাদের সবার সাথে দেখা হয়। নতুন জীবনের কথায় তারা মেতে ওঠে। নতুন পাড় দেওয়া শাড়ি পরিহীতা মেয়েরা সমালোচনায় মেতে ওঠে।

রাইন্দ্যে না বাইড়ে না আর উনানে দেই নাই ফুঁ / পররান্না খ্যায়েঁ পরে চাঁদের পারা মুখ। (লক্ষ্মী বাউরি, বয়স-৭৮,পোঃ দুর্লভপুর, ব্লক-গঙ্গাজলঘাটি)

চতুরা নারী নিজের সংসারের খরচ না করে, কায়িক পরিশ্রম না করে, দিদি-মাসি-পিসি পাতিয়ে অন্যের গৃহে খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেয়। ফলে চিন্তা-ভাবনাহীন শরীরের জেল্লা বাড়ে। গ্রাম-গঞ্জে শুধু সরলা-অবলা নারী ছাড়াও ব্যতিক্রমী এই ধরনের মন্দ নারীরও দেখা মেলে তা প্রবাদে প্রতিফলিত।

নদীর বলি চপচপানি / কুলির বালি কাদা / এতরাতে কুথা গেছিলি / পথে ক্যান্যে কাদা। (অপর্ণা সর্দার, বয়স-৫৫, খাটুল, ব্লক-জয়পুর)

অবৈধ সম্পর্ক সাধারণত চোখের অলক্ষে রাতের অন্ধকারেই হয়। কারণ, তা সামাজিক অপরাধ। পরিবার-আত্মীয়-স্বজন তা মেনে নিতে পারে না। অপরাধীদের নিকট তাই সমাজের কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে কৈফিয়ৎ চেয়ে নিতে পিছপা হয় না। প্রবাদে যেমন প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার মধুর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় তেমনি সমাজ গর্হিত (অপরাধ জগতের) সম্পর্কও ফুটে ওঠে। সমাজের ভাল-মন্দের দিকটিকে সমান ভাবে তুলে ধরা একজন প্রকৃত বিচারকের কাজ। প্রবাদ সেই ভূমিকা পালন করে থাকে।

এমন দিন কি যাব্যেক / খ্যাড় দিয়ে যে মাথা বাঁন্দে / তারও ভাতার হব্যেক। (মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, বিধবা, শ্যামবাজার, মাইতকার্ত্তিক পাড়া, ব্লক-সোনামুখী)

অভিজ্ঞতা লব্ধ মানুষেরা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে যতই দরিদ্র হোক বা কুরূপা হোক, তার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তবে স্বামী সোহাগ অবশ্যম্ভাবী। সমাজ ও সময় সর্বদা পরিবর্তনশীল তা প্রবাদ আমাদের বুঝিয়ে দেয়।

গান মান জানি নাই / খাই পান দক্তা / মাগ ভাতারে শুয়ে থাকি হেত্তা হত্তা। (মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, বিধবা, শ্যামবাজার, মাইতকার্ত্তিক পাড়া, ব্লক-সোনামুখী)

গ্রাম বাংলার দরিদ্র সংসারে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আমরণ থাকে। তাদের আনন্দের জন্য দরকার এক টুকরো পান-দক্তা। তাতেই তাদের জীবন মাধুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। গান-বাজনার আসর না বসলেও স্বামী-স্ত্রী খোলা ছাদের নীচে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রঙিন জগতে হারিয়ে যেতে পারে।

মরতে যাচ্চি শর বনে / তবু চাইচি ঘর পানে। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, গোয়ালাপাড়া, পোঃ বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের)

দরিদ্র ও বার্ধক্যে জীর্ণ নিপীড়িত পিতা-মাতা সংসারে সর্বদা অবহেলিত। তবু সংসারের প্রতি মায়া কাটাতে পারে না। তিল তিল করে গড়ে তোলা পরিবারকে ভুলতে পারে না। গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে শত দরিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের মণিকোঠায় আপামর জেগে থাকে তার পরিবার, তার সংসার, তার সন্তান-সন্ততির প্রতি মায়া-মমতা-ভালোবাসা। তাই মরণ কালেও সংসারের বন্ধন ছেদন করা বৃদ্ধ-পিতা-মাতার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রবাদে সেই মুমূর্ষু পিতা মাতার বেদনাতুর কথা তুলে ধরা হয়েছে।

কানা মাড় খাবি না নুন হাতে। (ফেলু কাপড়ি, বয়স-৬৫, গোয়ালাপাড়া, পোঃ বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের)

গ্রাম বাংলার হত দরিদ্র মানুষের 'নুন আন্তে পান্তা ফুরায়' অবস্থা তবুও তাদের শরীরে দয়া-মায়া চির বিরাজমান। অন্ন সংস্থানের যোগান না থাকায় 'ছাই ফেলতে ভাঁঙা কুলোর' মতো ন্যুনতম 'মাড়'(এরূপ দরিদ্র পরিবারে মাড় খেয়েই ক্ষুধা নিবারণ করে) খাবার প্রস্তাব দেয় প্রতিবেশীদের। যদিও প্রস্তাবের আগেই মাড় খাবার জন্য নুন নিয়ে হাজির। বস্তুতঃ পাড়া-প্রতিবেশীদের এই পারস্পরিক সুসম্পর্কটিকে এখানে দেখানো হয়েছে। সুখ-দুখ-হাসি-কান্না কে তারা ভাগ করে নেয় অর্থাৎ আগ বাড়িয়ে নিজের মত ভেবে পরিবারে সামিল হওয়ার কথা প্রবাদে প্রতিফলিত। 'কানা' অর্থাৎ দরিদ্র প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে। 'মাড়' অর্থ ভাতের ফ্যান।

জায়ের মায়ের কাল্লা ফুল। (ফেলু কাপড়ি, বয়স-৬৫, গোয়ালাপাড়া, পোঃ বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের)

সংসার বিনষ্টকারী হল কুমন্ত্রণা দাত্রী জায়ের মা। মুখে মিষ্টি হলেও পিছনে তিক্ততা বা বিষ ছড়িয়ে দেয় শ্বশুরবাড়িতে। শান্তি বিনষ্টকারী নিজের মেয়েকে ক্ষণিক সুখের জন্য সারা পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করে। তাই জায়ের মায়ের বাইরেটা ফুলের মতো সুন্দর হলেও ভিতরটা কদর্যপূর্ণ।

বউটি যেমন তেমন কই / জলের ভিতর ভাইজত্যে জানে খই। (উমা ঘোষ, বয়স-৪২, স্বাক্ষর, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

সংসারে শাশুড়ি-বধূর সম্পর্কটি বড়ই করুণ। শাশুড়ির মনের মতো কাজ না হলেই বধূকে হেনস্তা করতে ছাড়ে না। সরলা-অবলা বধূ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিবাহ পরবর্তী সেই রূপ আর নেই। নব বধূকে বাগে আনতে না পেরে আক্ষেপের সুরে শাশুড়ির আর্তি — দেখতে সরল হলেও, এই মেয়ে বউ এর যোগ্য নয়, এই মেয়ের দ্বারা অসম্ভব কাজ ও সম্ভব হতে পারে। দূর দৃষ্টিতে শাশুড়ির ভবিষদ্‌বাণী প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

নাই মামাকে কানা মামা। (কাজল ঘোষ,বয়স-৪০,স্বাক্ষর, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

আলোচ্য প্রবাদটি বাঁকুড়ার খাতড়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক চিরকালই মধুর। মামা চিরকালই ভাগ্নের প্রতি শুভাকাঙ্খী। এমন মামা কানা হলেও প্রয়োজন। 'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো' প্রবাদটি উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'নাই মামাকে কানা মামা'। কোনো কিছু না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো। প্রবাদটিতে বাহ্যিক রূপের থেকে অভ্যন্তরীণ মনের কদর বেশি তা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রবাদে অর্থনৈতিক অবস্থান

'জোর যার মুলুক তার' সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য দায়ী দুটি কারণ। প্রথমতঃ সমাজে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক স্তরভেদে শ্রেণী বৈষম্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং শ্রেণী বৈষম্যগত কারণে পুরুষের হস্তে অর্থ ন্যস্ত থাকে। সমাজে এই দুটি কারণে অর্থনৈতিক ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

একটি পরিবার সাধারণত অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পরিবারের পুরুষেরা সাধারণত বাইরের ভারি কর্মে লিপ্ত থাকে এবং নারীরা গৃহের হালকা কর্মে লিপ্ত থাকে। সুতরাং সমস্ত অর্থকরী উপার্জন পুরুষদেও হস্তে নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য নারীর উপর প্রভুত্ব ফলায় বা নারীদের পদদলিত করে রাখে। অপরদিকে আমাদের সমাজিক স্তরভেদে অর্থনৈতিক অবস্থা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত। মধ্যবিত্তের আবার দুটি শ্রেণী উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত। সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষেরা প্রবল প্রভাবশালী ও অতুল প্রতিপত্তি নিয়ে বসবাস করে, এদের মান-

মর্যাদা-যশ-খ্যাতি অপর দুটি শ্রেণী থেকে অনেক উপরে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উচ্চবিত্ত সমাজের সাথে মানিয়ে নিলেও নিম্নবিত্ত শ্রেনীর মানুষদের কোণঠাসা করেছে। নিম্নবিত্ত মানুষদের সমাজে বসবাস যেন গর্হিত অপরাধ। উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষেরা সাধারণত শহরাঞ্চলের অভিজাত পরিবারে বিলাসব্যসনে দিন যাপন করে। অপরদিকে নিম্নবিত্ত মানুষেরা প্রায়ই গ্রামাঞ্চলের প্রান্তে বসবাস করে। তারা সমস্ত দিক দিয়েই বঞ্চিত শ্রেণী। শ্রেণী বৈষম্যের কারণে দরিদ্র মানুষেরা উচ্চবিত্ত মানুষের সাথে সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলগুলিতে এই শ্রেনী ভেদাভেদ এখনও বর্তমান কেননা তাদের থেকে যারা, "অল্প বেশি" আর্থিক দিক দিয়ে উন্নততারা, "অল্প কম" মানুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল্য জ্ঞান করে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মানুষেরা "ধরা কে সরা জ্ঞান" করে ফলে, সমাজের মানুষদের কাছে তারা টিপ্পনি খেতেও পিছপা হয়না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী না পারে নিম্নবিত্তের সাথে সম্পর্ক রাখতে, না পারে তারা উচ্চবিত্তের সাথে সম্পর্ক রাখতে।

লিঙ্গভেদে অর্থনৈতিক ভাগ : ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লক	জনসংখ্যা-পুরুষ-মহিলা	মোট জনসংখ্যা	মোট প্রধান কর্মী এবং প্রান্তিক কর্মী	কাজের ভিন্নতা			
					কৃষিজীবি সংখ্যা	কৃষি শ্রমিক	কুটির শিল্প :ঝুড়ি, ঝাঁটা, খেলনা, লণ্ঠন, মাটির জিনিস	অন্যান্য : নাপিত, লেবার, তাঁতী, মৎস্যজীবি, সেবাধর্ম,
১	শালতোড়া	জনসংখ্যা	১৩৫৯৮০	৫৪৩৩৫	১৩০৯৯	১৯২৫২	১৭৬৬	২০২১৮
		পুরুষ	৬৯৭৩২	৩৯১৬০	১১৩০৪	১০৯৮৯	১১১১	১৫৭৫৬
		মহিলা	৬৬২৪৮	১৫৭৭৫	১৭৯৫	৮২৬৬৩	৬৫৫	৪৪৬২
২	মেজিয়া	জনসংখ্যা	৮৬১৮৮	৩০৪৩৯	৫৬৫৯	৮১২৭	৬৯০	১৫৯৬৩
		পুরুষ	৪৪৫৭৫	২৪৯১৩	৫২২৩	৫৫১৮	৪৮৬	১৩৬৮৬
		মহিলা	৪১৬১৩	৫৫২৬	৪৩৬	২৬০৯	২০৪	২২৭৭
৩	গঙ্গাজলঘাঁটি	জনসংখ্যা	১৮০৯৭৪	৬৯২৯১	১৬৮৫৬	২৫৩০১	২৫৭১	২৪৫৬৩
		পুরুষ	৯৩২৫২	৫১৭৮৭	১৪৩৯৭	১৫২৪৩	১৩৪২	২০৮০৫
		মহিলা	৮৭৭২২	১৭৫০৪	২৪৫৯	১০০৫৮	১২২৯	৩৭৫৮
৪	ছাতনা	জনসংখ্যা	১৯৫০৩৮	৭৭২১২	১৪৭৭৪	৩২৫০০	২৮৩৫	২৭১০৩
		পুরুষ	৯৯৫২৩	৫৫৪৯০	১৩৪০৫	১৭৫৬০	২৫২৯	২১৯৯৬
		মহিলা	৯৫৫১৫	২২৭২২	১৩৬৯	১৪৯৪০	১৩০৬	৫১০৭
৫	ইন্দপুর	জনসংখ্যা	১৫৫৬৫২২	৬৩৪০৩	১২৮৩৪	৩৩৯৩৯	২১০০	১৪৫৩০
		পুরুষ	৮০৫৫৬	৪৪১৫৩	১১৭২৪	১৯৩২২	১১৪৫	১১৯৬২
		মহিলা	৭৫৯৬৬	১৯২৫০	১১১০	১৪৬১৭	৯৫৫৫	২৫৬৮
৬	বাঁকুড়া-১	জনসংখ্যা	১০৭৬৮৫	৪০৩২৭	৭৭৪৪	১১৭৫১	২৯০৬	১৭৯২৬
		পুরুষ	৫৫০৭৯	৩০৮৩৬	৭৫৫০	৭১৭১	১৮৬৯	১৪৭৯১
		মহিলা	৫২৬০৬	৯৪৯১	৭৩৯	৪৫৮০	১০৩৭	৩১৩৫

৭	বাঁকুড়া - ২	জনসংখ্যা	১৪০৮৬৪	৫২৫২৫	১১২৮৮	১৩৫৭৮	২৭১৮	২৪৯৪১
		পুরুষ	৭২৩০২	৪০৮২৪	১০৩৪১	৮৬২৬	১৬৬৭	২০১৯০
		মহিলা	৬৮৫৬২	১১৭০১	৯৪৭	৪৯৫২	১০৫১	৪৭৫১
৮	বড়জোড়া	জনসংখ্যা	২০২০৪৯	৭৯১০৭	১৫২৩৫	২৮৬৭৭	৩১৩৫	৩২০৬০
		পুরুষ	১০৩৭৬৯	৬০২৪০	১৩৮১৫	১৮২২১	১৬২১	২৬৫৮৫
		মহিলা	৯৮২৮০	১৮৮৬৫	১৪২০	১০৪৫৬	১৫১৪	৫৪৭৫
৯	সোনামুখী	জনসংখ্যা	১৫৮৬৯৭	৭২৫৮১	১৮৩৩২	৩৮৩৫৭	২৭৩৭	১৩১৫৫
		পুরুষ	৮১৬১০	৯২২৪০	১৬৮৭৫	২২২৭৯	৮৭৯	৯২০৭
		মহিলা	৭৭০৮৭	২৩৩৪১	১৪৫৭	১৬০৭৮	১৮৫৮	৩৯৪৮
১০	পাত্রসায়ের	জনসংখ্যা	১৮৪০৭০	৭৯৪১৯	১৮৪৪১	৪২৪৯৪	৩৩৯১	১৫০৯৩
		পুরুষ	৯৩৬১৪	৫৬৬৬৯	১৬৯৬২	২৬০৯৮	১৬৮৩	১১৯২৬
		মহিলা	৭০৪৫৬	২২৭৫০	১৪৭৯	১৬৩৯৬	১৭০৮	৩১৬৭
১১	ইন্দাস	জনসংখ্যা	১৬৯৭৮৩	৬৮৮৬২	১৪৯৮২	৩৭২৪৬	১৪৭৫	১৫১৫৯
		পুরুষ	৮৬৬৯৭	৫২৭৬০	১৪৪১৯	২৪৬৫৩	৮২৪	১২৮৬৪
		মহিলা	৮৩০৮৬	১৬১০২	৫৬৩	১২৫৯৩	৬৫১	২২৯৫
১২	কোতুলপুর	জনসংখ্যা	১৮৮৭৭৫	৭৭৫৫৯	২৩৭৩৭	৩০২৪৯	৩৩১৮	২০২৫৫
		পুরুষ	৯৬৩৯৪	৫৮১৭০	২০৬৭৩	২০৭৬৪	১২৫৩	১৫৪৮০
		মহিলা	৯২৩৮১	১৯৩৮৯	৩০৬৪	৯৪৮৫	২০৬৫	৪৭৭৫
১৩	জয়পুর	জনসংখ্যা	১৫৬৯২০	৬৪১১৪	১৬৩১৪	২৮৮০৫	৩৭২৩	১৫২৭২
		পুরুষ	৮০১৩৮	৪৭৭৩৬	১৪৮৫৮	২০২৪০	১৩৫৭	১১২৮১
		মহিলা	৭৬৭৮২	১৬৩৭৮	১৪৫৬	৮৫৬৫	২৩৬৬	৩৯৯১
১৪	বিষ্ণুপুর	জনসংখ্যা	১৫৬৮২২	১৭১৫৬	১৪২৬১	২৯৯৬০	৩৮৭৬	১৯০৫৯
		পুরুষ	৭৯৯৪০	৪৬৩১১	১২৬৭৮	১৮৬৭২	৯১৭	১৪০৪৪
		মহিলা	৭৬৮৮১	২০৮৪৫	১৫৮৩	১১২৮৮	২৯৫৯	৫০১৫

১৫	ওন্দা	জনসংখ্যা	২৫২৯৮৪	৯৯৯৮৪	২৪৫২২	৪৬৭০৪	৪৬১৬	২৪১৪২
		পুরুষ	১২৯২৪৮	৭৩৪৬৬	২২২৫৪	২৮৮০৭	২৪৫০	১৯৯৫৫
		মহিলা	১২৩৭৩৬	২৬৫১৮	২২৬৮	১৭৮৯৭	২১৬৬	৪১৮৭
১৬	তালডাংরা	জনসংখ্যা	১৪৭৮৯৩	৬২৪১৩	১৩৬৬১	৩৫২৯৩	২২৩৪	১১২২৫
		পুরুষ	৭৪৯৯৯	৪২৪৩৭	১২৩০৪	২০২৯৪	৮০৩	৯০৩৬
		মহিলা	৭২৮৯৪	১৯৯৭৬	১৩৫৭	১৪৯৯৯	১৪৩১	২১৮৯
১৭	সিমলাপাল	জনসংখ্যা	১৪৩০৩৮	৫৭৯৪৮	১২০৬২	৩০৭৭৩	২৭২৬	১২৩৮৭
		পুরুষ	৭৩০০৮	৩৯৯৫২	১১১০৪	১৭৮৪৪	১২৪৯	৯৭৫৫
		মহিলা	৭০০৩০	১৭৯৯৬	৯৫৮	১২৯২৯	১৪৭৭	২৬৩২
১৮	খাতড়া	জনসংখ্যা	১১৭০৩০	৪৫৪৪১	৭৫৭৫	২৪১৮৬	৯১৪	১২৭২২
		পুরুষ	৬০০৫৮	৩২০৭১	৬৬৪৬	১৪৩০৫	৫৪০	১০৫৮০
		মহিলা	৫৬৯৭২	১৩৩৭০	৯২৯	৯৮৮১	৩৭৪	২১৮৬
১৯	হীড়বাঁধ	জনসংখ্যা	৮৩৮৩৪	৩৭৪৭০	৫৯৭৯	২৩৪৭৯	১০০০	৭০১২
		পুরুষ	৪২৯১৭	২৪২০৮	৫১৩১	১২৬৩৬	৬৪০	৫৮০১
		মহিলা	৪০৯১৭	১৩২৬২	৮৪৮	১০৮৪৩	৩৬০	১২১১
২০	রানিবাঁধ	জনসংখ্যা	১১৯০৮৯	৫৭৪৭৩	১৩১০৩	৩৩৬০২	২৯৬৭	৭৮০১
		পুরুষ	৬০২৯০	৩৪৫৬৪	১০৪৬৮	১৭১৮৯	১০৭৮	৫৮২৯
		মহিলা	৫৮৭৯৯	২২৯০৯	২৬৩৫	১৬৪১৩	১৮৮৯	১৯৭২
২১	রাইপুর	জনসংখ্যা	১৭১৩৭৭	৭৮২৩৩	১৮৩১৬	৪৫৯৪৪	২২৬৯	১১৭০৪
		পুরুষ	৮৭৩৩৯	৪৯৯৫৫	১৫৮৭৪	২৩৯৪২	১১৫৩	৮৯৪৬
		মহিলা	৮৪০৩৮	২৮২৭৮	২৪৪২	২২০০২	১১১৬	২৭১৮
২২	সারেঙ্গা	জনসংখ্যা	১০৬৮০৮	৪৫০১৫	১০০৬১	২৫৭৬৯	১৪৪৩	৭৭৪২
		পুরুষ	৫৪১৬৮	২৯৮৫৮	৮৮৩৯	১৩৯২০	৭৯৫	৬৩০৪
		মহিলা	৫২৬৪০	১৫১৫৭	১২২২	১১৮৪৯	৬৪৮	১৪৩৮

বাঁকুড়ার ২২টি ব্লকের ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য এবং অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তালিকাটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলা পিছিয়ে পড়া এক শহর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নয়, সমাজ, সংস্কৃতি, পেশা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা সমস্ত দিক দিয়েই। বাঁকুড়ার চার প্রান্তের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকের অর্থনৈতিক বৈষম্যটি বেশ চোখে পড়ার মতো,উত্তর বাঁকুড়ার ব্লকগুলিতে অর্থনৈতিক বৈষম্যটি সমান্তরাল নয়। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি শিল্পগুলি গড়ে ওঠায় একই সাথে শ্রমিক শ্রেণী ও একই সাথে চাকুরিজীবী মানুষ বসবাস করে। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের একই গ্রামাঞ্চলে বসতি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব বাঁকুড়ার সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়ের, অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য খুব একটা দেখা যায় না কারণ শহরাঞ্চলের মানুষেরা চাকুরিজীবী বা কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী। স্বাক্ষরতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মৃত্তিকার উর্বরতার দরুন এইসব অঞ্চলের মানুষেরা মোটামুটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল। কিন্তু দক্ষিণ বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক দিকটির কোন উন্নতি ঘটেনি আজও। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই কম, মৃত্তিকাও কম-বেশি অনুর্বর, বড় শিল্পও গড়ে ওঠেনি। জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার বসবাসকারী মানুষে প্রধান উপজীবিকা জঙ্গলের ফলমূল, অল্প পরিমাণে কৃষি-আবাদ, কুটির শিল্প, পশুপালন। যদিও এই অঞ্চলের নারী-পুরুষরা উভয়েই পাতা সেলাই তৈরি, মাছ ধরা, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি চরানো, মাছ ধরার জাল তৈরিতে সমান পারদর্শী। দক্ষিণ বাঁকুড়ার বসবাসকারী মানুষেরা দরিদ্র সীমার সর্বচ্চ নীচে অবস্থান করে। ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং পরিসংখ্যান তালিকাটিকে লক্ষ্য করলে কয়েকটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়ঃ

প্রথমত, ব্লকে শহরাঞ্চলে প্রধান কর্মী ও প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যা বেশি। গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলে উপার্জনের মূল মাধ্যম হল কৃষি। এবং দরিদ্র সীমার নিম্নে (নিম্নবৃত্ত, নিম্নবর্ণ) অবস্থানকারী মানুষেরা ঝুড়ি, ঝাঁটা, লণ্ঠন, পোড়া মাটির তৈরি খেলনা বা দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে অন্নসংস্থানের জোগাড় করে। আবার লক্ষ্য করা গেছে ছুতোর, কুমোর, কামার, হাঁড়ি, বাক্ষণ, সুঁড়ি, বাউরি নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাদের জাত ব্যবসা করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, মোট জনসংখ্যা অনুযায়ী শহরাঞ্চল এলাকায় প্রধান কর্মী ও প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যা বেশি। (উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী, বিদেশে বড় কোম্পানির সাথে যুক্ত, বড় ব্যবসা) ফলে শহরাঞ্চলের মানুষেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল।

তৃতীয়ত, মোট জনসংখ্যা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চল এলাকায় কৃষিজীবী এবং কুটির শিল্পের সংখ্যা সর্বাধিক। ফলে শহরাঞ্চলের মানুষেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল।

চতুর্থত, মোট জনসংখ্যা অনুযায়ী গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। (যারা নিম্নবিত্তের অন্তর্গত)।

পঞ্চমত, জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার মানুষেরা (কুটির শিল্প প্রধান জীবিকা) দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে।

ষষ্ঠত, কুটির শিল্প উপার্জনে মহিলার তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি।

সপ্তমত,মোট জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রধান কর্মীর পুরুষের সংখ্যা বেশি। মহিলা প্রায়ই চোখে পড়ে না।

সংগৃহীত প্রবাদ অর্থনৈতিক অবস্থানটি বিবৃত করা হল -

চইলত্যে লার‍্যে কুচি পাথর‍্যে / দে বুড়িকে টেসকি মটর‍্যে। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি, বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পোঃ ছাতনা, ব্লক-ছাতনা)

গ্রাম বাংলার প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম পথে হাঁটা পা। 'নুন আন্তে পান্তা ফুরায়' এর মতো অবস্থা যে সমস্ত মানুষদের, তাদের ট্যাক্সি-মোটরে চড়া দূরের কথা রিক্সা, বাস, ট্রেনের কথা ভাবাই কঠিন। টাকা খরচ করে যানবাহনে যাওয়া, বার্ধক্যে জর্জরিত বৃদ্ধার পক্ষেও অসম্ভব হয়। তাই কুচি পাথরের রাস্তায় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা চলতে না পারলে ব্যঙ্গ করে বুড়িকে ট্যাক্সি-মোটরে চাপার কথা বলেছে।

খ্যাত্যেঁ নাই শুত্যে / হপর হপর ডাক পাইড়ব্যেক / দেড়্যা ক্যাঁথায় শুত্যে। (নিভা হাজরা, বয়স-৫৫, জাতি-সদগোপ, পেশা-চাষি, হরিডিহি, গুন্নাথ, ব্লক-ইন্দপুর) অথবাদিত্যে না থুত্যে / দেড়্যা খাট্যে হপর হপর শুত্যে। (তাপসি সহিস, বয়স-৫৫, সহিসপাড়া, হাতিরামপুর, ব্লক-খাতড়া)

আলোচ্য প্রবাদটি আর্থিক অস্বচ্ছলতার নিদর্শন। "দিন আনে দিন খায়" এর মতো অবস্থা তবুও দরিদ্র-অসহায় মানুষগুলি একবেলা উপোস করে দিব্যি সুখে-শান্তিতে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীরগুলি নিশ্চিন্তে 'দেড় ফুট' খাটে একটি গোটা পরিবার মনের শান্তিতে নাক ডেকে ঘুমোতে পারে। 'হপর হপর ডাক পাইড়ব্যেক' অর্থাৎ নাক ডাকার কথা বলা হয়েছে।

রিসকার গাড়ি ফাঁইস্যে গেল্য / ত্যাল দিল্যে খলা চ্যাইট্যে গেল্য। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর,বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি,বাসস্ট্যাণ্ড,ঝাঁটিপাহাড়ী, পো-ছাতনা, ব্লক-ছাতনা)

গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থাপন্ন মানুষেরাই কেবল মাত্র রিক্সাতে চড়তে পারে। দরিদ্র মানুষের কাছে রিক্সাতে চড়া দিবাস্বপ্ন। গরীব মানুষেরা দূর দূরান্তরগন্তব্যস্থল পৌঁছায় পায়ে হেঁটে বা খুব জোর সাইকেলেচড়ে। তাই প্রবাদটিতে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, খাবারের জন্য তপ্ত মাটির পাত্রে (খলা) এক ফোঁটা তেল জোটাতে পারে না সে টাকা খরচ করে রিক্সাতে চড়লে রিক্সার চাকা ফেসে (পাঙচার) হওয়ার উপক্রম হবে। অর্থাৎ বড়লোকি চাল-চলন গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলের মানুষের নিকট একে বারেই পরিত্যজ্য

অপরদিকে, রিক্সা চালানোর কথা উঠে এসেছে। পেশাগত প্রবাদটিতে দেখানো হয়েছে যে অর্থ উপার্জনের এক অপর পন্থা রিক্সা চালানো। রিক্সা চালিয়ে শারীরিক পরিশ্রম করে সংসার চালানোর মতো সংগ্রামী মানুষদের কথা শুনতে পাই।

খ্যাত্যেঁ পাই নাই চুঁয়া মুড়ি / কুল বাতাসার গড়্যাগড়্যি। (পোস্ত ঘোষ, বয়স-৬০, নিরক্ষর, মচড়াকেন্দ, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

আলোচ্য প্রবাদটিতে চিত্রিত হয়েছে যে, মানুষের অতি দীর্ণ অবস্থাতেও অহংকার বজায় থাকে। যার পোড়া (চুঁয়া) মুড়ি খাওয়ার সামর্থ নেই সেখানে সে কুল-বাতাসা খাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছল পরিবারে বাতাসা কেনার সামর্থ থাকে না। দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা অহংকারী মানুষটি এমন ভাব দেখায়যে, তার কুল-বাতাসা ছাড়া চুয়া মুড়ি মুখে রুচে না।

কি কাপড়ের খেদ আছে / বাসাইন দিব্যেক কাপড় গদিত্যে। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া)

পাড়া-প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে প্রবাদটি উক্ত হয়েছে। বিবাহিত নারীদের জীবন সুখের হয় প্রথমত, তার স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অগাধ ভালোবাসা থাকলে। দ্বিতীয়ত, স্বামী যদি অর্থনৈতিক স্বচ্ছল হয়। উক্ত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে, তার স্বামী, স্ত্রীর জন্য একটি কাপড় কেনার ক্ষমতা নয় বহু কাপড় কেনার ক্ষমতা রাখে। এমন কি স্ত্রীর জন্য কাপড়ের গদিও হাজির করতে পারে। তাই তার কাপড় কিনতে না পারার দুঃখ নেই। কারণ, তার স্বামী অবস্থাপন্ন।

প্রবাদটিতে জীবিকার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর কথা যার কাপড়ের বড় ব্যবসা আছে।

আজি কাইল কাপড় কাইল্য / তাই দুখখু পাই / আর সকাল বেলায় রেইন্দে বেড়ে সইন্দ্যে বেলাই খাই। (পোস্ত ঘোষ, বয়স-৬০, নিরক্ষর, মচড়াকেন্দ, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

বর্তমানে আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে অতীতের সুখের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। পূর্বে তার স্বচ্ছল অবস্থা ছিল তাই মন ভাল থাকত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করত, আহারের জন্য সকাল সন্ধ্যে দু-বেলা হাঁড়িচড়তো। বর্তমানে অর্থের অভাবে এক কাপড়ে একবেলা আহার করে দিন যাপন করতে হয়। তাই দুঃখ করে বলেছে 'আজি কাইল কাপড় কাইল্য / তাই দুখখু পাই'।

"ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া"। (লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তী, বয়স-৭৫, এম.এ স্বাক্ষর, গ্রাম-গোয়ালাপাড়া, গ্রাম+পো-মাকড়কোল, ব্লক-ওন্দা)

ভিক্ষার চালের বিচার করা চলে না। কারণ, ভিক্ষার চাল সমান হয় না কোথাও ভালো চাল বা কোথাও মন্দ চাল হয়ে থাকে। দরিদ্র সংসারে দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য ভিক্ষা বিত্তির পথ বেছে নিতে হয়। 'কাঁড়া' অর্থাৎ ছাল ছাড়ানো বা পরিষ্কার চাল। 'আঁকাড়া' অর্থাৎ ছাল ছাড়ানো নয় এমনচাল বা ভাঙা চাল।

মনে কর্য়ে ছিল্যম খাব চিঁড়্যা দই / বিধাতা লিখে দিল্য শুধু বাতাস্যা খই। (লক্ষ্মী বাউরি, বয়স-৭৮, পোঃ দুর্লভপুর, ব্লক-গঙ্গাজলঘাটি)

তৎকালীন দরিদ্র সমাজে দই ও চিঁড়ে খাওয়া বিলাসিতার সমতুল্য। সন্তান বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। স্বামী দায়িত্বে থাকাকালীন যেমন আহার (জীবন যাপন) গ্রহণ করতো। বর্তমানে সন্তানের দায়িত্বে থাকাকালীন মাতা একই আহার (জীবন যাপন) গ্রহণ করে চলেছে। উক্ত প্রবাদটিতে অস্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবাদটিতে অন্য একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো বৈধব্য অবস্থায় সমাজ-সংস্কার বশত তাকে নিরামিষ আহার ভোজন করতে হতো। একবেলা স্বপাকে এবং আর এক বেলা তাকে খই,দই, চিঁড়া, বাতাসা খেয়েই রাত্রি যাপন করতে হতো। আর্থিক অবস্থাপন্ন মানুষেরা দই চিঁড়ে খেয়েই আহার সমাপ্ত করত। কিন্তু দীন-দরিদ্র মানুষেরা খই-বাতাসা খেয়ে রাত্রি যাপন করত। যদিও এই সমাজ-সংস্কারটি এখনো গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে বর্তমান।

এ্যাক পয়সা নাই ঝুলিত্যে / লাফ দিচ্ছে কুলিত্যে। (অনিতা মন্ডল, বয়স-৫৫, গৃহবধূ, পাহাড়পুর, ব্লক-বড়জোড়া)

প্রবাদটিতে আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিকটি ধরা পড়েছে। 'লাফ দিচ্ছে কুলিত্যে' অর্থাৎ গ্রাম ছেড়ে শহরে প্রবেশ করার কথা। কুলিতে (রাস্তায়) নামতে প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু প্রবাদে ব্যঙ্গ করে একজন দরিদ্র মানুষকে এই কথা বলা হয়েছে যে আবেগের বশে পূর্ব-পশ্চাৎ না ভেবে শহরের পথে পা বাড়ায়, শহুরে জীবনকে আয়ত্ত করতে চায়।

মা গ মা তাল পিঠ্যা খাব / দুর দুর খেরানির বিটি / তাল কুথায় পাব। (হীরারানি মণ্ডল, বয়স-৭০, জাতি-শুঁড়ি, নিরক্ষর, বিধবা, পাহাড়পুর, ব্লক-বড়জোড়া)

মা-মেয়ের সম্পর্ক চিরকালের স্নেহাদৃত। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণেই সন্তানের 'মা' ডাক এবং সন্তানের ন্যুনতম আবদারও তিক্ত মনে হয়। গ্রামে-গঞ্জে তাল সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু পিঠের জন্য চাই চাল-গুড়-তেল। কম রোজগারে মা-বাবার কাছে তাল পিঠে খাওয়া বিলাসিতার লক্ষণ। কারণ, তাদের দু-বেলা অন্নই জোটে না ঠিকমত। নিম্নবিত্ত গ্রাম্যবধূর নিকট উক্ত উপাদানগুলির আয়োজন বড়ই কঠিন। তাই কন্যার ছোট্ট আবদার পূরণ করতে না পারার যন্ত্রণায় ক্রুদ্ধ মাতা কন্যাকে 'খেরানির বিটি' (গ্রাম্য মেয়েলী গালাগাল বিশেষ) বলে মনের জ্বালা মিটিয়েছে।

উক্ত প্রবাদটিতে সমাজ-সংস্কৃতিরও একটি রূপ ফুটে উঠেছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গ্রামাঞ্চলগুলিতে আজও জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীতে তালের পিঠের সুস্বাদু পদ আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ ঠাকুরের কাছে 'তাল-পিঠে' প্রসাদ হিসেবে নিবেদিত হয়।

ট্যাঁকার চ্যায়েঁ ট্যাঁকার সুদ বেশি / ব্যাটার চ্যায়েঁ লাতি বেশি। (শ্রী সুনীল কুমার সিংহ মহাপাত্র, বয়স-৬২, গোয়ালাপাড়া, জীবনপুর, ব্লক-খাতড়া)

উচ্চ-মধ্যবিত্ত মানুষদের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পরিবার পরিপূর্ণ হয় সন্ততির মধ্য দিয়ে তেমনি দুগুণ টাকা বেশি উপার্জন হয় 'সুদের ব্যবসায়'। সুদের কারবার লাভ জনক অবস্থা এবং পরবর্তী প্রজন্ম নাতির মধ্যদিয়ে বংশ রক্ষা দুটোই আনন্দ ও সুখকর।

উক্ত প্রবাদটিতে ভিন্ন ধর্মী এক পেশার কথা উল্লেখিত সুদের ব্যবসা। সমাজে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষেরা টাকা ধার দিত চড়া সুদে, নিম্নবিত্ত মানুষদের।প্রবাদটি এবং পেশাটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এখনও প্রচলিত।

এত যদি সুখ কপাল্যে / তবে ছেঁড়্যা কাঁথ্যা ক্যান্যে / কাগ বগল্যে। (মিতালি ঘোষ, বয়স-৩২, স্নাতক, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

দরিদ্র পরিবারে কোন এক বধূর গর্জে ওঠা প্রতিবাদ স্বামীর প্রতি। তাদের ভাগ্যের চাকা আর ফেরে না। তাই নিত্য দিনের মতো ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাদের কপালে যেমন সুখ নেই তেমনি আর্থিক উন্নতির সম্ভবনাও নেই।

এখন বুজুস নাই / পরে খাবি আমড়া। (লক্ষ্মী কোনার, বয়স-৫৫, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

ভবিষ্যত্দ্রষ্টা দরিদ্র পিতার উপদেশ সন্তানের প্রতি। দরিদ্রতার কারণে যৌবনে অর্থ সঞ্চয় করার কারণ হল ভবিষ্যতের পথ সুনিশ্চিত করা, বার্ধক্য অবস্থায় যাতে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে পারে। কারণ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষকে বিচার করে, অর্থ দিয়ে। বস্তুতঃ সমাজের নিষ্ঠুর দিকটি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছে প্রবাদে।

সাত বউকে এ্যাকটি পিঠ্যা / খইড়ক্যার ড্যাগে ঘি / গুন্দুর গুন্দুর করছ্যে বউরা / খ্যাত্যে লারছ্য কি?
(বিধান মুখার্জ্জী, বয়স-৫০, অধ্যাপক, শরৎপল্লী রোড, পোঃ কেঁন্দুয়াডিহি, ব্লক-বাঁকুড়া)

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে একটি পরিবার সঠিক আহারের যোগান দিতে পারে না। একান্নবর্তী পরিবার হলেও উপার্জনে সক্ষম পুরুষের সংখ্যা অপ্রতুল। সমাজের তাড়নায় অল্পবয়সে ছেলেদের বিবাহ দিলেও উপার্জনক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি অথচ পরিবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাড়ির বউরা ফিস্ ফিস্ করে মনের খেদ মেটাচ্ছে আর একটি মাত্র পিঠে ভাগ করে তার স্বাদ মেটাচ্ছে। 'খইড়ক্যা' অর্থাৎ সরু কাঠি। 'ড্যাগে' অর্থাৎ ডগে। কাঠির ডগে ঘি নিয়ে একটি পিঠে ভাগ করে খাচ্ছে।

উক্ত প্রবাদটিতে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কথা তুলে ধরলেও আরো বেশ কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত।

১. লিঙ্গভেদে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অসূর্যম্পশ্যা নারীর মনের খেদ।
২. গ্রামাঞ্চলগুলিতে একান্নবর্তী পরিবার এখনো বর্তমান থাকলেও শহুরাঞ্চলে লুপ্তপ্রায়।
৩. মকর সংক্রান্তিতে ঘি এ ভাজা পিঠে খাওয়ার রীতি এখনও চোখে পড়ে।

গায়ে নাই ছাল চামড়্যা / মদ গিলে গামল্যা গামল্যা।

প্রবাদটিতে সমাজের শিক্ষাগত দিকটিও ফুটে ওঠে — রোগা বা রুগ্ন শরীরে মাদক দ্রব্য সেবন হানিকারক। অন্তর্নিহিত অর্থটি হল দরিদ্র পরিবার ন্যুনতম যে অর্থ উপার্জন করে তা নেশা করেই শেষ করে দেয়। দরিদ্র পরিবারের মা-বউমার মনের খেদ স্পষ্ট হয়েছে।

মুলাখান্দির বিয়া হচ্ছে এই কত লয় / তার আবার ব্যঙ্গপায়ের বাজনা। (রিঙ্কু সহিস, বয়স-৪৫, গৃহবধূ, হাতিরামপুর, সহিসপাড়া, ব্লক-খাতড়া)

আলোচ্য প্রবাদটিতে দরিদ্র পিতার শখ-আহ্লাদ কে পাড়া-প্রতিবেশীরা ব্যঙ্গ করেছে। পিতা যতই দরিদ্র হোক বা কন্যা যতই কুরূপা হোক — সব পিতার কাছেই কন্যারা রাজকন্যার থেকে কোন অংশে কম নয়। তাই পিতা সসম্মানে রাজকীয় ভাবে রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন করতে চাই। শুভ লগ্ন উপস্থিত হলে ঘর-বাড়ি বন্ধক রেখে বাদ্য-বাজনা সহযোগে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ একজন দরিদ্র পিতার আর্থিক অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে উক্ত প্রবাদটিতে।

নাইক মাগীর খাইক বেশি / নির্ধনা মাগীর গরব বেশি। (মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, বিধবা, শ্যামবাজার, মাইতকার্ত্তিক পাড়া, ব্লক-সোনামুখী)

সমাজে যে নারী উপার্জনে অক্ষম (নির্ধন) বা অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দ, সেই নারীর অহংকার করা যেমন বৃথা তেমনি দরিদ্র নারীর ক্ষুধা বা অতি আহার নিন্দনীয়। কারণ, দরিদ্রপূর্ণ পরিবারে নারীর স্থান পুরুষের পদতলে।

থাকে নাই বাটি, হয়েছে ঘটি। (গনেশ সেন, বয়স-৫০ উর্দ্ধে, পেশা-চাষ, রায়পাড়া, ব্লক-ইন্দাস)

আলোচ্য প্রবাদে বোঝানো হয়েছে যে, বাটি থেকে ঘটি বৃহৎ আকারেরহয়। বর্তমান সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পূর্ব পুরুষদের অস্বচ্ছল থেকে স্বচ্ছল অবস্থা পরিবারে ফিরিয়ে আনার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে সমাজের মান-সম্মান-প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাব তুমার সাথে / তুমার খাব নাই খাব আমার গাঁটে। (বনলতা সু, বয়স-৫০,পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

দৈনন্দিন জীবনে প্রেম-প্রীতির মূল্য অর্থ দিয়ে হয় না। হয় পরিণতির মধ্য দিয়ে,পরিণয় সূত্রে আবদ্ধের মধ্য দিয়ে। তাই একজন নারী অর্থনৈতিক সামাজিক দিকটিকে ভুলে গিয়ে তার প্রেমিকের সাথে চিরদিনের সঙ্গী হওয়ার কামনা জানিয়েছেন। তৎকালীন সমাজের নারী হয়েও নিজের রুজি রোজগারের কথা বলেছে। নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অস্বচ্ছল তাকে তুচ্ছ করে প্রেমের জয়গান গাওয়ার ইঙ্গিত আছে প্রবাদটিতে।

উল্টা নামে খিলটা ঘুচা। (শ্যামল কর্মকার, বয়স-৪৫, স্বাক্ষর, মলিয়ান, লালবাজার, ব্লক-হীড়বাঁধ)

মধ্যবিত্ত জীবনে একজন পিতা জীবনের যে টুকু সঞ্চয় করে তা সন্তান বিলাসব্যসনে উড়িয়ে দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধ পিতার প্রতিবাদ সন্তানের প্রতি। উপার্জনে সক্ষম একজন পিতার ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ে যেটুকু নাম, যেটুকু সুনাম অর্জন করেছে তা অযোগ্য পুত্র নিঃস্ব করতে পিছপা হয় না। সমাজে বদনাম বা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়লে মধ্যবিত্ত বাড়ীর দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়। এখানে উল্টা নাম অর্থাৎ বদনাম। 'খিলটা ঘুচা' অর্থাৎ বাড়ির দরজা বন্ধ।

বাপ মাই আর বহিনট্যা দু চখ্যের বালি হইল্য / গতর খাঁটাই ভাতার আমার ছাগল ছেড়ি কিন্যে দিল্য / শাশুড়ি মাগীর টাইফুয়েডে ডাক্তার দেখাই ঘুঁচাই দিল্য। (সুদর্শন সেনগুপ্ত, বয়স-৬২, পেশায় হোমিও ডাক্তার (প্রাকটিস), উচ্চমাধ্যমিক পাশ, গোপালপুর, মালিয়ান, ব্লক-হীড়বাঁধ)

দরিদ্রপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ক্ষেদোক্তি। গ্রাম্য বধূ শ্বশুর বাড়ি আসার পর থেকেই বাপ মা বোন সবাই শাশুড়ির চোখের বালি হয়েছে। যদিও স্বামী সোহাগ করে ছাগল ছেড়ি (ছাগলের বাচ্চা) কিনে দিয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ির অসুস্থার কারণে পরিচর্চার জন্য ছাগল ছেড়ি বিক্রী করতে হয়। ন্যুনতম রোজগারের টাকায় ছাগল বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে যেমন পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিকটি ফুটে উঠেছে তেমনি গ্রাম্য বাঙালি পরিবারে যতই শাশুড়ি বধূর কলহ হোক না কেন, অগ্রজদের প্রতি কর্তব্য, সেই দিকটিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আলোচ্য প্রবাদটিতে।

যতই কর হাঁইফাঁই / কুথাউ কিছু নাইরে ভাই।(রামসত্য সিংহ মহাপাত্র, বয়স-৭০, নিরক্ষর,গ্রাম-আমঝোর, পোঃ সুখাডালি, ব্লক-সারেঙ্গা)

একজন দরিদ্র স্বামী বিলাসব্যসনে নিমগ্ন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন উক্ত প্রবাদটি। প্রবাদটি স্বামীর আর্থিক অবস্থার কথা ঘোষণা করেছে। দরিদ্র স্বামীর অল্প রোজগারের টাকায় স্ত্রীর প্রসাধন সামগ্রী কেনার ক্ষমতা নেই। তাই যতই চেঁচামেচি কর না কেন আখেরে কোন লাভ হবে না।

কুথাও কিছু নাই নগরে / ঢাক বাজচ্যে নীল ভাঙড়ে। (বাসন্তী দে, বয়স-৫৫, গৃহবধূ, চতুর্থ শ্রেণী,বাকতোড়, ব্লক-তালডাংরা)

আপামর ধনী পরিবারে বিনোদন ফুর্তির জন্য আর্থিক অপচয়ের দিকটি দু চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। পূজা-পার্বন কোন কিছুই নেই কিন্তু (অপ্রতুল সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি) অসময়ে ঢাক বাজাচ্ছে ভাঙড়ে। খামখেয়ালী বিত্তশালী পরিবারে অপচয়ের কথা বলা হয়েছে।

প্রবাদে শিক্ষা ব্যবস্থা

সামাজিক পরিকাঠামোর অপর এক অঙ্গ হল শিক্ষা। বিশেষ রূপে জ্ঞান অর্জন করাই হল শিক্ষা। আমাদের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি অর্থ বহন করে। প্রথমতঃ পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে পঠন-পাঠন-পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অনুশীলন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তা সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি অর্জনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ পরিমল ভূষণ কর, তাঁর 'সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেছেন - "যখন সচেতনভাবে এবং বিশেষ যত্ন সহকারে কোন বিদ্যা অর্জন করা হয় অথবা কোন কৌশলে আয়ত্ত করা হয়, তখন তাহাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলা হয়।"[২] শিক্ষার দ্বিতীয় অর্থ হল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তা পাড়া-প্রতিবেশী, পরিবার, আত্মীয়স্বজন-এর নিকট প্রাপ্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। যা অতীত কালে চিরাচরিত জীবন ধারার ঐতিহ্যগুলিকে বহন করে চলে। এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করি, প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে পারি। এই শিক্ষা আনুষ্ঠানিক বা বিদ্যায়তনিক শিক্ষা নয়। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-প্রার্থনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে এই শিক্ষা অর্জন করা হয়। এই শিক্ষা ভেতরের শিক্ষা, ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠ এবং সুন্দর করে তোলার শিক্ষা।

প্রাচীনকালে সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সহজ-সরল। তাদের শিক্ষালাভের একমাত্র পথ হল পরিবারের বয়স্ক গুরুজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের মুখে মুখে প্রচারিত অভিজ্ঞতা লব্ধ বাক্য। সেই বাক্য প্রবাদের আকারে পরিবেশিত হত লোকশিক্ষার মাধ্যমে। ব্যক্তিত্ব ও সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করতে সাহায্য করত এই প্রবাদগুলি।

আমাদের আলোচ্য প্রবাদ সম্পর্কে সেকথা চরম সত্য। প্রবাদ, ভাল-মন্দের দিক নির্দেশ করে, ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করে। সমাজের অভিভাবক হয়ে শিক্ষাদেয়। কিন্তু কখনো গুরুগিরি করে না। লোকসমাজকে সতর্ক ও সচেতন করে সহজ-সরল ভাষায়। প্রবাদ শুধুমাত্র অন্যায়, অত্যাচার,

ভাণ্ডামির বিরুদ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ বা মানুষের মনোরঞ্জন করে না, লোকশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দানও করে থাকে। যা আজও আমাদের কাছে আদৃত হয়ে রয়েছে।

২২ টি ব্লকের শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসংখ্যা

শহর ও গ্রাম : ২০১১ আদমশুমারি

ক্রমিক নং	ব্লক		শিক্ষিত জনসংখ্যা			অশিক্ষিতের জনসংখ্যা		
			জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
১	শালতোড়া	মোট	৭২৮৫৪	৪৪৮৮৪৬	২৮০০৮	৬৩১২৬	২৪৮৮৬	৩৮২৪০
		গ্রাম	৭২৮৫৪	৪৪৮৪৬	২৮০০৮	৬৩১২৬	২৪৮৮৬	৩৮২৪০
		শহর	০	০	০	০	০	০
২	মেজিয়া	মোট	৫০২৪৪	৩০২৯১	১৯৯৫৩	৩৫৯৪৪	১৪২৮৪	২১৬৬০
		গ্রাম	৫০২৪৪	৩০২৯১	১৯৯৫৩	৩৫৯৪৪	১৪২৮৪	২১৬৬০
		শহর	০	০	০	০	০	০
৩	গঙ্গাজলঘাটি	মোট	১০৮৬৭৫	৬৫৪৫১	৪৩২২৪	৭২২৯৯	২৭৮০১	৪৪৪৯৮
		গ্রাম	১০৮৬৭৫	৬৫৪৫১	৪৩২২৪	৭২২৯৯	২৭৮০১	৪৪৪৯৮
		শহর	০	০	০	০	০	০
৪	ছাতনা	মোট	১১২২৬৭	৬৭৬৫১	৪৪৬১৬	৮২৭৭১	৩১৮৭২	৫০৮৯৯
		গ্রাম	১০৮৫৮৫	৬৫৫৬৮	৪৩০১৮	৮১১২৭	৩১২২৯	৪৯৮৯
		শহর	৩৬৮২	২০৮৩	১৫৯৯	১৬৪৪	৬৪৩	১০০১
৫	ইন্দপুর	মোট	৯২৪৩৪	৫৬৩০৫	৩৬১২৯	৬৪০৮৮	২৪২৫১	৩৯৮৩৭
		গ্রাম	৯২৪৩৪	৫৬৩০৫	৩৬১২৯	৬৪০৮৮	২৪২৫১	৩৯৮৩৭
		শহর	০	০	০	০	০	০
৬	বাঁকুড়া-১	মোট	৬৫৩৯৫	৩৮৫১৩	২৬৮৮২	৪২২৯০	১৬৫৬৬	২৫৭২৪
		গ্রাম	৬৫৩৯৫	৩৮৫১৩	২৬৮৮২	৪২২৯০	১৬৫৬৬	২৫৭২৪
		শহর	০	০	০	০	০	০

৭	বাঁকুড়া-২	মোট গ্রাম শহর	৯১৯৩৯ ৯১৯৩৯ ০	৫৩২৮৩ ৫৩২৮৩ ০	৩৮৬৫৬ ৩৮৬৫৬ ০	৪৮৯২৫ ৪৮৯২৫ ০	১৯০১৯ ১৯০১৯ ০	২৯৯০৬ ২৯৯০৬ ০
৮	বড়জোড়া	মোট গ্রাম শহর	১২৮৪৪৩ ১০৯৫০৯ ০	৭৪৫৫১ ৬৪১৫৩ ১০৩৯৮	৫৩৮৯২ ৫৪৩৫৬ ৮৫৩৬	৭৩৬০৬ ৬৬৭৫৪ ৬৮৫২	২৯২১৮ ২৬৪৭১ ২৭৪৭	৪৪৩৮৮ ৪০২৮৩ ৪১০৫
৯	সোনামুখী	মোট গ্রাম শহর	৯২৫০০ ৯২৫০০ ০	৫৪১২৭ ৫৪১০৭ ০	৩৮৩৯৩ ৩৮৩৯৩ ০	৬৬১৯৭ ৬৬১৯৭ ০	২৭৫০৩ ২৭৫০৩ ০	৩৮৬৯৪ ৩৮৬৯৪ ০
১০	পাত্রসায়ের	মোট গ্রাম শহর	১০৫৬২৯ ১০৫৬২৯ ০	৬০৭৫৫ ৬০৭৫৫ ০	৪৪৮৭৪ ৪৪৮৭৪ ০	৭৮৪৪১ ৭৮৪৪১ ০	৩২৮৫৯ ৩২৮৫৯ ০	৪৫৫৮২ ৪৫৫৮২ ০
১১	ইন্দাস	মোট গ্রাম শহর	১০৮৪৬৯ ১০৮৪৬৯ ০	৬০৯৭২ ৬০৯৭২ ০	৪৭৪৯৭ ৪৭৪৯৭ ০	৬১৩১৪ ৬১৩১৪ ০	২৫৭২৫ ২৫৭২৫ ০	৩৫৫৮৯ ৩৫৫৮৯ ০
১২	কোতুলপুর	মোট গ্রাম শহর	১৩১৩২৭ ১২৪৬৭৪ ৬৬৫৩	৭৩১৩৩ ৬৯৫৯৬ ৩৫৩৭	৫৮১৯৪ ৫৫০৭৮ ৩১১৬	৫৭৪৪৮ ৫৫৬১৮ ১৮৩০	২৩২৬১ ২২৫১৮ ৭২৪	৩৪১৮৭ ৩৩১০০ ১০৮৭
১৩	জয়পুর	মোট গ্রাম শহর	১০৩৯৫১ ১০৩৯৫১ ০	৫৯০৮৮ ৫৯০৮৮ ০	৪৪৮৬৩ ৪৪৮৬৩ ০	৫২৯৬৯ ৫২৯৬৯ ০	২১০৫০ ২১০৫০ ০	৩১৯১৯ ৩১৯১৯ ০
১৪	বিষ্ণুপুর	মোট গ্রাম শহর	৯১৩০৯ ৯১৩০৯ ০	৫৩০৯৯ ৫৩০৯৯ ০	৩৮২১০ ৩৮২১০ ০	৬৫৫১৩ ৬৫৫১৩ ০	২৬৮৪২ ২৬৮৪২ ০	৩৫৬৭১ ৩৮৬৭১ ০

১৫	ওন্দা	মোট গ্রাম শহর	১৪৪৬১৮ ১৪৪৬১৮ ০	৮৪৫৪৬ ৮৪৫৪৬ ০	৬০০৭২ ৬০০৭২ ০	১০৮৩২৬৬ ১০৮৩৬৬ ০	৪৪৭০২ ৪৪৭০২ ০	৩৬৩৬৪ ৬৩৬৬৪ ০
১৬	তালডাংরা	মোট গ্রাম শহর	৯২১৬৮ ৯২১৬৮ ০	৫৩০০৬ ৫৩০৬ ০	৩৯১৬২ ৩৯১৬২ ০	৫৫৭৫২ ৫৫৭২৫ ০	২১৯৯৩ ২১৯৯৩ ০	৩৩৭৩২ ৩৩৭২২ ০
১৭	সিমলাপাল	মোট গ্রাম শহর	৮৬১৭২ ৮১৭৮৯ ৪৩৭৪	৫০৩৭২ ৪৭৮৯২ ২৪৮০	৩৫৮০০ ৩৫৮০০ ১৮৯৪	৩৫৮৬৬ ৫৪০৩৪ ২৮৩২	২২৬৩৬ ২১৪২৩ ১২১৩	৩৪২৩০ ৩২৬১১ ১৬১৯
১৮	খাতড়া	মোট গ্রাম শহর	৭৪৭৭৫ ৬৪৮৮২ ৯৮৯৩	৪৪৩৪২ ২৫৯১৯ ৫৪২৩	৩০৪৯৩ ২৫৯৬৩ ৪৪৭০	৪২২৫৫ ৩৯৭১০ ২৫৯৫	১৫৭১৬ ১৪৭৮৩ ৯৩৩	২৬৫৩৯ ২৪৯২৭ ১৬১২
১৯	হীড়াবাঁধ	মোট গ্রাম শহর	৪৭৩৯৯ ৪৭৩৯৯ ০	২৯৪৪৬ ২৯৪৪৬ ০	১৭৯৫৩ ১৭৯৫৩ ০	৩৬৪৩৫ ৩৬৪৩৫ ০	১৩৪৭১ ১৩৪৭১ ০	২২৯৬৪ ২২৯৬৪ ০
২০	রানিবাঁধ	মোট গ্রাম শহর	৭২০৭০ ৭২০৭০ ০	৪৩০৭৪ ৪৩০৭৪ ০	২৮৯৯৬ ২৮৯৯৬ ০	৪৭০১৯ ৪৭০১৯ ০	১৭২১৬ ১৭২১৬ ০	২৯৮০৩ ২৯৮০৩ ০
২১	রাইপুর	মোট গ্রাম শহর	১০৮১৮৮ ১০৩৫৪ ৪৭৩৪	৬৩৬৪৫ ৬১০৩৮ ২৬০৭	৪৪৫৪৩ ৪২৪১৬ ২১২৭	৩৬১৮৯ ৬১৬৪৩ ১৫৪৬	২৩৬৯৪ ২৩০৬৯ ৬২৫	৩৯৪৯৫ ৩৮৫৭৪ ৯২১
২২	সারেঙ্গা	মোট গ্রাম শহর	৭০০৯৬ ৭০০৯৬ ০	৪০৪২৭ ৪০৪২৭ ০	২৯৬৬৯ ২৯৬৬৯ ০	৩৬৭১২ ৩৬৭১২ ০	১৩৭৪১ ১৩৭৪১ ০	২২৯৭১ ২২৯৭১ ০

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	প্রাক্ প্রাথমিক	প্রাথমিক	নিম্ন বিদ্যালয়	বিদ্যালয়	উচ্চ বিদ্যালয়	মহাবিদ্যালয়	বিশ্ব বিদ্যালয়	ইঞ্জিয়ারিং কলেজ	পলিটেকনিক কলেজ	ম্যানেজমেন্ট কলেজ	আই.টি.আই.	গ্রন্থাগার	অঙ্গনওয়াড়ি	নিউজপেপার
১	শালতোড়া	১৯৪	১৮৯	৩৭	১৮	১২	১	০	০	০	০	০	২২	০	৮৩
২	মেজিয়া	১৩০	১৩১	৩৩	১২	৬	০	০	০	০	০	০	২৪	৫৯	৬৯
৩	গঙ্গাজলঘাটি	২৪৯	২৪৬	৫০	২৮	১৩	২	০	০	০	০	০	৪৩	১৪৪	১১১
৪	ছাতনা	৩৩৬	৩৩৬	৫২	২৯	১৩	১	০	০	০	০	০	৮৯	৪৪৫	১৫৫
৫	ইন্দপুর	২৫৪	২৫০	৪৪	৩৩	১৬	০	০	০	০	০	০	৫৭	১৭৯	১২৬
৬	বাঁকুড়া-১	১৭৩	৩৯	২০	১৫	১০	৫	১	২	০	০	১	২৮	১২২	৫৬
৭	বাঁকুড়া-২	২০২	১৯৪	৩৫	২৪	১০	০	০	০	০	০	৫	৪৭	১১৬	১০৯
৮	বড়জোড়া	২৪১	২৩৬	৬২	২৬	১৫	০	০	০	০	০	২৩	২৫	১৫১	১২৫
৯	সোনামুখী	২৪২	২৩৩	৪৭	১৯	১৭	০	০	০	০	০	৩	২৪	১৩৭	১১৭

১০	পাত্রসায়ের	১৮৪	১৭০	৩৯	২৪	১৭	১	০	১	০	০	০	১৫	১২৬	১২৬
১১	ইন্দাস	১৭৬	১৭৪	৪৭	২৪	১৫	০	০	০	১	০	৩	১২	১২১	১০২
১২	কোতুলপুর	২১৩	২০৭	৫৫	২৩	১৩	১	০	০	০	০	১	১১	১২১	১৪৪
১৩	জয়পুর	২১৬	২১১	৪৯	২৯	১৬	০	০	০	০	০	১	১২	১১৪	১০৯
১৪	বিষ্ণুপুর	১৯৭	১৮৭	৪৭	১৮	১৩	৫	০	৪	৫	০	৪	৩৯	১২৯	৯৩
১৫	ওন্দা	৩০৭	৩০৩	৭২	৩৭	২৫	৪	০	২	০	০	১	৯৩	২৩২	২২৭
১৬	তালডাংরা	২০৫	২০০	৪৪	২৯	১৪	১	০	০	০	০	১	৫৭	১২৯	৯৬
১৭	সিমলাপাল	১৯২	১৮৭	৩৮	২১	১১	০	০	০	০	০	৩	১৯	১৫০	১৪৩
১৮	খাতড়া	১৩৮	১৩৬	৩৩	১৪	৮	১	০	০	০	০	৩	২৯	১৩৪	৭৮
১৯	হীড়বাঁধ	১১৬	১১৫	২১	১৪	৮	০	০	০	০	০	০	৭	৫৮	৫০
২০	রানিবাঁধ	১৮৩	১৮০	৪৬	২১	১৬	৩	০	৩	০	৩	৬	৪০	১৫৯	৭৭
২১	রাইপুর	২৩৩	২২৯	৬২	৩২	২৩	০	০	০	০	০	৩	০	০	০
২২	সারেঙ্গা	১৫৯	১৫৫	৩২	২৬	১৬	১	০	০	০	০	০	৩	০	১৪২

বাঁকুড়া জেলার ২২ টি ব্লকের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও ২০১১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান তথ্যঅনুযায়ী বলা যায়,মোট শিক্ষিত জনসংখ্যা অনুযায়ী মহিলার তুলনায় পুরুষেরা শিক্ষিত। এবং অশিক্ষিত জনসংখ্যার হার অনুযায়ী পুরুষের তুলনায় মহিলার শিক্ষার হার কম। অর্থাৎ মহিলার তুলনায় পুরুষেরা শিক্ষিত। শহর কেন্দ্রিক গ্রামগুলিতে পুরুষ-মহিলার শিক্ষার হার সমানুপাতিক এবং অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও কম। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির কারণে ছাত্র-ছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রত্যহ স্কুল-কলেজ গুলিতে যাওয়া আসা করে। শহরাঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ী, প্রাইমারি, আপার-প্রাইমারি, স্কুল, ডিগ্রি কলেজ ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, আই.আই.টি. কলেজ, ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটগুলি বর্তমান। সদর বাঁকুড়াতে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সহ অন্যান্য ব্লকের লাইব্রেরিগুলিতে পাঠক সংখ্যা অনেক বেশি। দৈনন্দিন জীবনের অবসরে প্রত্যহ লাইব্রেরির সাথে যোগাযোগ বর্তমান। মহিলা ও পুরুষের শিক্ষার হার সমানুপাতিক। শহরাঞ্চলের মেয়েরাও শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান বেশকিছু মহিলা চাকুরিজীবী, গৃহের বাইরে তারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। অপরদিকে গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম এবং দুর্যোগ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। যদিও বা অঙ্গনওয়াড়ী বা প্রাইমারি বা আপার প্রাইমারির ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যহ দেখা যায়। কিন্তু স্কুল কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। দেখা গেছে শিক্ষকেরা গ্রামের প্রাইমারি স্কুল গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ধরে বেঁধে কোনো ক্রমে পড়াশোনা করান। আবার ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক অচ্ছলতার দরুন লোকের বাড়িতে কাজ, ইট ভাটায় কাজ, চাষের কাজে সাহায্য করে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, স্কুল ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান মূলক শিক্ষাব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকটি ব্লকে লাইব্রেরি থাকলেও পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা নগণ্য। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার হার খুবই কম। শিক্ষিত লোকজনের সংখ্যাও প্রায় দেখা যায় না। দু-একটি বাড়ির ছেলেরা স্কুল কলেজের গন্ডী পেরেলেও মেয়েদের দেখায় মেলে না। পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা শিক্ষাগত যোগ্যতায় অনেক পিছিয়ে। পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষার অভাবে মেয়েদের স্থান হয় রান্না ঘরে-শোয়ার ঘরে-গোয়াল ঘরে-মাঠে-ঘাটে। সমাজ রক্ষার্থে আঠেরো বছর বা তারও আগে পাত্রস্থ করা হয়। সংগৃহীত প্রবাদে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিবৃত করা হল -

শিইখ্যে ছিল্যম হুরহুরি ক্যাল্যে / ভুইল্যে গেল্যম ভাতার ক্যাল্যে। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি, বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পো-ছাতনা, ব্লক-ছাতনা) অথবা শিখে

ছিলম রং রং কালে / ভুলে গেছি মহাঞ্জালে। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, নিরক্ষর, গোয়ালাপাড়া, বন-বীরসিংহ, পোঃ পাত্রসায়ের, ব্লক-পাত্রসায়ের, ৭২২২০৭)

পিতার অধীনে কন্যা যতদিন থাকে, ততদিন পরিচর্চায় থাকে, রাজকন্যার মতো থাকে। আদর-আবদার শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু সমাজের চাপে পিতাকে নতমস্তক হয়ে বা নতি স্বীকার করে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হয়। ফলস্বরূপ সংসারের চাপে, শ্বশুরবাড়ির চাপে, স্বামীর চাপে অনাদরে ভুলতে শুরু করে পড়াশোনা। বিবাহ পরবর্তী বধূর কাছে শিক্ষা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। হুরহুরি কাল বা রং রং কাল হল কৈশোর উর্ত্তীণ কাল। ভাতার কাল বা মহাজঞ্জাল কাল হল সংসার জীবন।

বাপ জানে নাই লেইখ্যা পড়্যা / ছেল্যা পঁন্দে দিয়েছ্যে দুট্যা কাগজ ছেঁড়্যা। (বিনা কেওড়া, বয়স-৪৫, জাতি-কেওড়া, পেশা-স্কুলে রান্নার কাজে সাহায্যকারী, দুর্লভপুর, পোঃ গঙ্গাজলঘাটি, ব্লক-গঙ্গাজলঘাটি, ৭২২১৪৪)

আলোচ্য প্রবাদে পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুঁথিগত শিক্ষার পরিসংখ্যান হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে পড়ছে। কিন্তু অতীতে লোকশিক্ষাই ছিল প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র আধার। তাই পিতা বা পিতামহের বা পূর্বপুরুষদের আমলে লেখাপড়ার (পুঁথিগত) গুরুত্ব কম ছিল। কিন্তু সেই লোকশিক্ষার গুণ ও মান কোন অংশে কম ছিল না। অর্থাৎ অতীতে পুঁথিগত শিক্ষার বালাই না থাকলেও প্রকৃত জ্ঞানের অভাব ছিল না, কিন্তু সেই বাপের ছেলে (পরবর্তী প্রজন্ম) দু-কলম লেখাপড়া করে নিজেকে জ্ঞানী মনে করছে। পিতা-পিতামহ উপদেষ্টা সকল বয়স্ক মানুষেরা পুঁতিগত শিক্ষাকে তুচ্ছ বা হেয় করে লোকশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অসটা দেখ্যে জমটা রেবাল্য। (শ্যামলী দে, বয়স-৫৪, মাধ্যমিক,গৃহবধূ,বাহাদুরগঞ্জ, পোঃ বিষ্ণুপুর, ব্লক-বিষ্ণুপুর)

কথায় বলে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"- অতি সামান্য শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সবজান্তা মনে করাটা সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়। সেই মতো 'অল্পবিদ্যা গ্রহণকারী' মানুষটার আত্ম-অহংবোধ দেখা মাত্র অসহ্য মনে হয়। অসটা (আত্ম অহংকার) দেখার ফলশ্রুতি হিসাবে জসটা (ঠোঁটের উপর

ঘা) বেরিয়ে যায়। যে কিছুই জানে না অথচ নিজেকে সবজান্তা মনে করার ভান করে সেই রূপ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে।

মাংসই মাস বিদ্ধি / দুদে বিদ্ধি বল / ঘি তে বুদ্ধি বিদ্ধি / শাগে বিদ্ধি মল। (নিমাই চন্দ্র, বয়স-৫০, চাষবাস, নিরক্ষর, পোঃ মির্জাপুর, ব্লক-কোতুলপুর)

গ্রাম বাংলায় লোকশিক্ষার মাধ্যম হল প্রবাদ। লোকশিক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি মাংস আহার করলে শরীরে চর্বি বা মাস বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ আহারের ফলে শরীরে শক্তি অর্জন হয়, ঘৃত আহারে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং নিত্য শাকাহারে শরীরের বর্জ্য পদার্থ সহজেই বর্হিগত হয়। অর্থাৎ শরীরকে সুস্থ-সুষ্ঠ রাখতে হলে ঘি, দুধ, মাংস, শাক আহার প্রয়োজনীয় প্রবাদ সেই শিক্ষায় দেয়।

বুদ্ধি থাকল্যে কলঙ্গাতেও ছেল্যা হয়। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, নিরক্ষর, গোয়ালাপাড়া, পোঃ বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের, ৭২২২০৭)

এখানে উপস্থিত বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সংসার করতে গেলে ন্যুনতম উপস্থিত বুদ্ধি দরকার। তবেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল পরিবার হলেও বা দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটালেও সংসার সুখের হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে, বংশ বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক অথচ ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি না হলেও এক ছাদের তলায় একসাথে কাটানো যায় সুখে-শান্তিতে। সেখানে অট্টালিকার প্রয়োজন পড়ে না। তার জন্য দরকার সংসার মানিয়ে নেওয়ার গুণ,উপস্থিত বুদ্ধি। 'কলঙ্গা' অর্থাৎ মাটির দেওয়ালে তৈরি ছোট তাক।

চাচাই বল আর কাকাই বল / একটা কলার দাম ১২ আনা। (দেবদুলাল সু, বয়স-৫৫ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, পোঃ বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

সমাজ জীবনে সম্পর্কের থেকে মূল্য বেশি অর্থের। আলোচ্য প্রবাদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক মানা হয় না। আত্মীয় স্বজনকেও পরিস্থিতিতে খরিদ্দার হতে হয়। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মায়া-মমতা-প্রীতি-ভালবাসার কোন গুরুত্ব নেই। সমাজের রূঢ় কঠোর বাস্তব দিকটির উদ্‌ঘাটন করেছে। অগ্রিম সতর্কবার্তা এখানে সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে।

তাছাড়া এখানে পেশার কথাও উল্লেখ আছে, ফল বিক্রেতার কথা আছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ১২ আনার মূল্য এখানকার বাজারে অর্থহীন বা অচল।

বীরপুরুষ মরে বীরত্বে / কাপুরুষ মরে ভয়ে। (দেবদুলাল সু, বয়স-৫৫ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, পোঃ বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

ভয়কে জয় করার আশ্বাস উক্ত প্রবাদটিতে ঘোষিত হয়েছে। বীর পুরুষেরা সর্বদা আদৃত সম্মানীয় কারণ, তারা সৎ পথে চালিত, পরিশ্রমী তাই তাদের মান-যশ-খ্যাতি হাতের মুঠোয় তাই তারা বীর বিক্রম। পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে সর্বদা সেই শিক্ষা দেয়। বীর বিক্রম হওয়ার পথে চালিত করে। অপর দিকে অসৎ পথে চালিত মানুষজনের মন সর্বদা দুর্বল ও শঙ্কিত থাকে। প্রবাদ বীরপুরুষ ও কাপুরুষের দিকটিকে বিশ্লেষণ করে ভাল ও মন্দের দিক নির্দেশ করেছে।

বোকায় মরে বারবার বুদ্ধিমানে মরে একবার। (দেবদুলাল সু, বয়স-৫৫ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, পোঃ বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা সমাজের চোখে পূজনীয়,সম্মানীয়। তাদের বুদ্ধির জোরে যুক্তি তর্কে কেউ পরাজয় যেমন করতে পারে না। তেমনি সর্বদা সর্বত্র তারা জয়ী হয়। কিন্তু বোকা ব্যক্তিরা সর্বদা অপমানিত হয়, তারা বুদ্ধিমানদের সাথে পেরে ওঠে না।

না বইল্ল্যে শুনবি কি কইর‍্যে। (লক্ষণ দাস, বয়স-৬৩, জীবনপুর, গোয়ালাপাড়া, ব্লক-খাতড়া)

লোকশিক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি সংযত স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। মানুষেরা লজ্জা বা জড়তার কারণে অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। মনের মধ্যে রয়ে যায়, বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। ফলে অপর ব্যক্তির কাছে বিষয়টি অজ্ঞাত রয়ে যায়।

শিখলি কুথায় আর ঠকলি কুথায়। (দুলাল মন্ডল, বয়স-৪২, জীবনপুর, গোয়ালাপাড়া, ব্লক-খাতড়া)

বুদ্ধিমান মানুষেরা ঠকে শেখে। বুদ্ধিমানেরা জীবনে চলার পথে সর্বদা সচেতন হয়। ঠকে গিয়ে তখনই জীবনে শিক্ষা পায়। শত হাত দূরে থাকে — সেই সব মন্দ মানুষের কাছে।কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবনের চলার পথে সর্বদা ঠকে যায়, তারা জীবনে চলাচলের পথে সর্বদা ভীত, সঙ্কিত। তারা বারবার ভুল পথেই যায়। তারপর ঠকে গিয়েও শিক্ষা পায় না। বস্তুতঃ মূর্খেরা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে নেয়। বারবার সেই মানুষের দ্বারাই প্রতারিত হয়। তাই জীবনে বারবার ঠকে গিয়েও সঠিক শিক্ষা নিতে পারে না।

এ্যলাবেলা লোক হলে বুজা ভার। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, নিরক্ষর, গোয়ালাপাড়া, পোঃ বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের, ৭২২২০৭)

প্রবাদ - শিক্ষার মাধ্যমে সতর্ক করে। কর্মক্ষেত্রে নির্বোধ বা অজ্ঞ মানুষেরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ্যলাবেল্যাঅর্থাৎ তুচ্ছ তাচ্ছিল অর্থে গুরুত্বহীন ব্যক্তিকে বোঝায়। 'বুজা' অর্থাৎ সং বুধ্যক। বোঝা >বোধগম্য।

প্রবাদে রাজনৈতিক অবস্থা

সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রত্যেক সমাজের সামাজিক কর্তব্য-কর্মগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত সমাজের মানুষগুলিকে নানানভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক বৈষম্য (উচ্চবিত্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নিম্নবিত্ত শ্রেণী), বর্ণ বৈষম্য {ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, (উচ্চবর্ণ), হাঁড়ি, বাউরি, শূদ্র, মুচি, মেথর (নিম্নবর্ণ)}, লিঙ্গ বৈষম্য (নারী ও পুরুষ), পেশা বৈষম্য (ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিজীবি, চাকুরিজীবি, মুচি, মেথর)। প্রতিটি শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থবোধ দ্বারা সমাজে ক্ষমতা ভোগ করে বা কর্তৃত্ব ফলায় বা বলপ্রয়োগ করে। নিম্নবিত্ত বা নিম্নবর্ণের মানুষগুলির উপর কর্তৃত্ব ফলায়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের মানুষেরা ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে প্রশাসনিক সুযোগ, সুবিধা, নিয়ম, কানুন হাতের মুঠোয় ধরে রাখে। ক্ষমতা এবং বল হল প্রকৃতির মৌল সত্তার বহিঃপ্রকাশ। ক্ষমতাশালী মানুষেরা সমাজ জীবনের সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শ, প্রশাসনিক আদব-কায়দায় সুশৃঙ্খলিত হয়ে কর্তৃত্ব দাবী করে। প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান মানুষেরাই বলপ্রয়োগ বাকর্তৃত্ব বা ক্ষমতার প্রয়োগ করে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ গুলির উপর। "জোর যার মুলুক তার" - দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবাদটি সেই রাজনৈতিক অবস্থাকে সুপষ্ট করেছে। সমাজের নিম্নশ্রেণী মানুষদের ক্ষমতাবান উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেই সমাজের নিম্নশ্রেণী মানুষদের দমিয়ে রাখে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন মানুষেরা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সমাজ কল্যাণের জন্য, দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য,কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষেরা সেই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা সমাজের মাথা হয়ে উঠেছে এবং সমাজকে চির অন্ধকারে নিমজ্জিত করে চলেছে।

আলোচ্য প্রবাদে রাজনৈতিক অবস্থা বলতে বর্তমান রাজনৈতিক কোন রং এর পার্টি নয়। রাজনৈতিক অবস্থা বলতে বোঝানো হয়েছে — শাসক শ্রেণী বা পুরুষতন্ত্র বা উচ্চ শ্রেণীর প্রভাবশালী আভিজাত সম্প্রদায় যারা সর্বদা নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে । ঘটনাগুলির বহিঃপ্রকাশ হয় পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীর ক্ষমতা, বিদ্যায়তনে, খেলার মাঠ, সভা-সমিতি, বন্ধু মহলে।

সংগৃহীত প্রবাদে উপরিউক্ত রাজনৈতিক অবস্থার কথাই তুলে ধরা হয়েছে প্রবাদে-

"পায়ের শব্দ দুমদুমানি / রাইত্যের ঘুম নাই ভাদুমুনি" (রিঙ্কু সহিস, বয়স-৪৫, নিরক্ষর, পেশা-দিন মজুর, সহিসপাড়া, হাতিরামপুর, ব্লক-খাতড়া)

উক্ত প্রবাদটিতে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। স্বার্থন্বেষী ক্ষমতাশালী দলগুলি নিজ ক্ষমতা অধিকারের লোভে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাতের অন্ধকারে কু-কার্য সম্পাদন করে থাকে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শক্তিশালী দলগুলি চাপ সৃষ্টি করে দুর্বল দলগুলির প্রতি। অপরপক্ষে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ক্ষমতা লোভে রণযুদ্ধে মেতে ওঠে। দুই দলের চাপ সৃষ্টি হয় সমাজের সাধারণ মানুষগুলির উপর। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়" — সাধারণ মানুষেরা ভয়ে-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে তারা নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে, জীবন সংশয় হয়। বিশেষ করে গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যার ফল ভোগ করে সাধারণ গৃহী মানুষেরা। প্রবাদটিতে রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

সেই পলাশের তিন পা। (চক্রধর দত্ত, বয়স-৪৫, সপ্তম শ্রেণী, জাতি-তাঁতী, তাঁতী পাড়া, শালডিহা রোড, কেঞ্জাকুড়া, ব্লক-বাঁকুড়া-১)

প্রত্যেক প্রজা-দরদি রাজারই কাম্য প্রজার হিত কামনা করা। রাজকার্য পরিচালনা রাজার কর্ম ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠ-শৃঙ্খল রাজকার্যের দ্বারা রাজ্যের কল্যাণ ও প্রজা কল্যাণ সম্ভব হয়। কিন্তু দুষ্ট রাজা বা স্বৈরাচারী রাজা প্রজাদের উপর জুলুম চালায়। প্রজারা তা মেনে নেয় বটে কিন্তু রাজার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে। উক্ত প্রবাদে বলা হয়েছে , আজ সেই রাজাও নাই রাজত্বও নাই কিন্তু সরকার আছে সরকারের অধীনস্থ সাধারণ মানুষেরা আছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে প্রবাদটিতে। সরকারি জোর-জুলুম, ন্যায়-নীতির প্রতি তিতি

বিরক্ত হয়ে গর্জে ওঠে। অতীত এবং বর্তমানে পলাশ ফুলের তিনটি পাপড়ির অবস্থানের পরিবর্তন নেই, সেই রকম অতীত এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তন হয় নি।

লাগাই দিয়ে ঠাটর বাজি / দাঁড়াই দাঁড়াই রঙ্গ দেখি। (মিতালি ঘোষ, বয়স-৩২, স্নাতক, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

প্রবাদটিতে প্রতিফলিত হয়েছে, মধ্যস্থ ব্যক্তির কূটকৌশলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাশালী মানুষের দ্বন্দ্ব। এবং কূটনৈতিক কৌশলে ঠাটর বাজি (দ্বন্দ্ব) বাঁধিয়ে তার মজা বা তামাসা লুটছে। তারা ক্ষমতার আগ্রাসী মনোভাব এবং অধিকার লালসায় একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। লক্ষ্য করা যায় সমাজ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে কিছু মুষ্ঠিমেয় মানুষেরা আধিপত্য বিস্তারে মগ্ন। বলপ্রয়োগ করে সমাজের পদাধিকার ছিনিয়ে নিতে পিছপা হয় না। এখানে দুই ক্ষমতাশালী কর্তৃত্ব পরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের কথা উঠে এলেও, যুদ্ধ-হাঙ্গমা লাগানো স্বার্থন্বেষী মধ্যস্থ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।

টিকটিকির দোড় মড়কাচা পর্যন্ত। (মিতালি ঘোষ, বয়স-৩২, স্নাতক, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

প্রত্যেক প্রাণী জগতের একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জীবন থাকে। কখনো সেই সীমা লঙ্ঘণ করেনা বা করতে পারে না। টিকটিকি সরীসৃপ প্রাণী। মড়কাচা বা মদুনির বাইরে তার আনাগোনা নিষিদ্ধ। বাড়ির ছাদের নীচে কড়িকাঠে তার অবাধ যাতায়াত। কিন্তু তার বাইরে সে ভীত-শঙ্কিত। লোক চক্ষুর অন্তরালে শান্তিপ্রিয় প্রাণীটি গোপনে থাকে। বস্তুতঃ ক্ষমতা প্রবণ মানুষ দুর্বল মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে ঐ রূপ প্রবাদটি বলে থাকে।

গরীব যারা রইল গরীব / তরা ভটভটি গিলা চাঁপাইলিলি। (সুদর্শন সেনগুপ্ত, বয়স-৬২, পেশায়-হোমিওডাক্তার (প্রাকটিস), উচ্চমাধ্যমিক পাশ, গোপালপুর, মালিয়ান, ব্লক-হীড়বাঁধ)

ক্ষমতার লোভে মত্ত প্রভাবশালী মানুষেরা সমাজে ক্রমশ মাথা ফুঁড়ে ওঠে। আগ্রাসী মনোভাবনায় অধিকার লোভে মত্ত হয়ে ওঠে। সমাজের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে প্রভাবশালী মানুষেরা। অপরদিকে পরিশ্রমী গরীব মানুষের ভাগ্যের চাকার উন্নতি আর হয় না। বস্তুতঃ ক্ষমতাশালী মানুষেরা দুর্বল শ্রেনীর উপর শোষণ করে সর্বস্ব লুটে নেয়। শ্রমিক শ্রেণীরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। যা পায় তাতেও ভাগ বসায়। শ্রমিক শ্রেণী থেকে শুরু করে চাষি সম্প্রদায়ের এক অবস্থা। চাষ-আবাদের ফসল ঠিকমত হলেও ন্যায্য দাম পাই না। ফলে এক শ্রেণীর মানুষ ধনী

হতেই থাকে অপর শ্রেণী দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। উচ্চবিত্ত মানুষেরা বহুতল বাড়ির নীচে বসবাস করে, গাড়ি-বাড়ি-সম্পত্তি নিয়ে মেতে থাকে। অপরদিকে শোষিত দরিদ্র মানুষের ঠাঁই হয় ঝুপড়ি ঘরে, টিনের চালায় বা খড়ের চালার নীচে। 'ভটভটি' অর্থাৎ বাইক বা মোটর সাইকেল।

বেট্যা আমার র‍্যা কাড়ে নাই / বহু মাগীর শিইখনাত্যে / ছ মাস হইল মায়ে ডাক্যে নাই / বিহান মাগীর কথাত্যে। (সুদর্শন সেনগুপ্ত, বয়স-৬২, পেশায়-হোমিওডাক্তার (প্রাকটিস), উচ্চমাধ্যমিক পাশ, গোপালপুর, মালিয়ান, ব্লক-হীড়বাঁধ)

বর্ণ বৈষম্য ছাড়াও অপর এক বিরোধ আমাদের চোখে পড়ে পরিবারের কর্তা বা কত্রীর্র আধিপত্য বিস্তার বা ক্ষমতার লড়াই। প্রবাদটিতে বউমা এবং বেয়ান এর আধিপত্য বা অধিকারবোধ দেখানো হয়েছে। যৌথ পরিবারে বাড়ির ছেলেদেরও মহাবিপদ। দজ্জাল বৌ এর ভয়ে মায়ের উপর মানসিক নির্যাতন লক্ষ্য করেও চুপ থাকতে হয়। কারণ পরিবারে ছেলের বৌ বা শাশুড়ি সর্বেসর্বা। তাই ছেলেকে মেনে নিতে হয় বৌ এবং শাশুড়ির কর্তৃত্ব। নিজ সন্তানের এরূপ আচরণে মা দুঃখ ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে — "ব্যাট্যা আমার রা কাড়ে নাই"। বস্তুতঃ দশ মাস দশ দিন গর্ভ ধারিণী মায়ের নিকট সন্তান বিচ্ছেদের কারণ হল বৌমা এবং কু-মন্ত্রণা দাত্রী বেয়ান।

ল্যাঠার উপর ল্যাঠ্যা দেবতার মার। (চক্রধর দত্ত, বয়স-৪৫, সপ্তম শ্রেণী, জাতি-তাঁতী, তাঁতী পাড়া, শালডিহা রোড, কেঞ্জাকুড়া, বাঁকুড়া-১)

সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার দুর্বল প্রজাদের উপর শোষণ ও শাসন চালায়। ধান রোপন থেকে শুরু করে, মাঠ থেকে তোলা পর্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত চাষিরা জমিদারের 'কর' থেকে রেহায় পায় না। চাষিদের জমি ও ফসলের উপর হাত পড়ে জমিদারের। সারা বছর কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্ত চাষিদের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না জেনেও চাষিরা পুনরায় চাষ করে। তার উপর রয়েছে প্রকৃতির অত্যাচার। কখনো অত্যধিক বর্ষণে কখনো বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হয়। তাই প্রবাদে দরিদ্র চাষিরা আক্ষেপের সুরে বলেছেন, জমিদারের অত্যাচার থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির অত্যাচারের হাত থেকে রেহায় পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেবতার থাকে। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের বিষয় থেকে দেবতা নির্লিপ্ত থেকেছে। জমিদারের অত্যাচার, জমিদারের কর, প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষিদের সারা বৎসরের উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

অপরদিকে প্রবাদটি যেমন অর্থনৈতিক অবস্থাটিকেও সুপষ্ট করেছে, তেমনি চাষি সম্প্রদায়ের জীবিকার কথাটিও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

সব শালাকে ল্যারো প্যারো বঁড়্যা শালাকে ধর। (বিধান মুখার্জ্জী, বয়স-৫০, অধ্যাপক, শরৎপল্লী রোড, পোঃ কেঁন্দুয়াডিহি, ব্লক-বাঁকুড়া)

অন্যায় ভাবে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মানুষের পতন অনিবার্য। ক্ষমতাবান মানুষেরা ক্ষমতার প্রাচুর্যে সমাজের কল্যাণ সাধনে নয়, সমাজকে অধঃপতিত করার ব্রতে লিপ্ত থাকে। দুর্বল মানুষের উপর ছড়ি ঘোরানো আধিপত্য ও ক্ষমতায় বলীয়ান মানুষকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। সময়ের সাথে সাথে ক্ষমতা প্রধান মানুষটিকে (সমস্যার মূল মানুষটিকে) একবদ্ধ হয়ে সমাজ থেকে উচ্ছেদ বা উৎখাত করতে পিছপা হয় না। 'বঁড়্যা' বলতে এখানে সমস্যার মূল মানুষটিকে বোঝানো হয়েছে।

বাগ নাই বাগিনীর উদবদয়। (পূর্ণিমা সূত্রধর,বয়স-৬৫, বিধবা, বিষ্ণুপুর, চকবাজার, ব্লক-বিষ্ণুপুর)

একান্নবর্তী পরিবারে কলহ পরায়ণ দজ্জাল বউ সংসারে অনৈক্যের সৃষ্টি করে। যে গৃহে অলস স্বামী বা শ্বশুর কাজ কর্মে (উপার্জনে) অক্ষম, সেই গৃহে বধূই কর্ত্রী। তখনই স্বামী বা শাশুড়িকে অশ্রদ্ধা করে গৃহকর্ত্রী। পরিবার যায় রসাতলে। বধূর দুর্বব্যহার সংসারে দুগর্তি ডেকে আনে। বস্তুতঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ফলায় বধূ — যা সমাজে বাঘিনীর উপদ্রবেরই সমতুল্য।

উপর থেকে পড়ে গেল দু মুখা সাপ / যার যেখায় ব্যথা তার সেখায় হাত। (বনলতা সু, বয়স-৫০,পেশা -তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

একই সময়ে 'দু-নৌকায় পা' রেখে চলতে পারে না তাতে পতন অনিবার্য। চতুর মানুষেরা নিজ নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে ভালো সেজে থাকে। আড়ালে পরচর্চা ও পরনিন্দা করে একে অপরের কাছে এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে। কিন্তু সমাজ যখন 'দু মুখো সাপের' স্বরূপ জানতে পারে তখন সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যথিত চিত্তে আফসোস করতে থাকে। প্রবাদটিতে চতুর মানুষের চতুরতা প্রকাশ পেয়েছে।

থাকর‍্যে কুকুর আমার আশ্যে / ভাত দুব্য তখ্যে পষমাসে। (মৌসুমী সিংহ মহাপাত্র, বয়স-১৫, কুসুমটিকারী, সুখাডালি, ব্লক-সারেঙ্গা)

প্রবাদে বাহ্যিক অর্থে বোঝা যাচ্ছে যে, খাবারের লোভ দেখিয়ে কুকুরকে পৌষমাস পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা। আভ্যন্তরীণ অর্থ হল পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ গুলিকে সমস্ত রকম কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু পারিশ্রমিক আর পাওয়া যায় না।ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা দরিদ্র মানুষগুলিকে ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে ঘেরাটোপে বন্দী করে রাখতে চায়।

অসময়ে বর্ষাকাল / হরিণে চাটে বাঘের গাল। (দেবদুলাল সু, বয়স ৫৫ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

ভাগ্যবানের ভাগ্য সর্বদা সুপ্রসন্ন হয় কারণ, সৌভাগ্য সর্বদা সময়ের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন সময়ও সুপ্রসন্ন। হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কার্যের ফলে ভাগ্যদ্বয় ঘটে। উপর মহলের মানুষেরাও তুষ্ট হয়। কারণ, প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপ্রসন্নে একজন সাধারণ মানুষের ভাগ্যের চাকা সহজেই ঘুরে যায়। ভাগ্য সর্বদা কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে না। ভাগ্যের ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। অসময়ে বর্ষাকাল নেমে আসে, বাঘের সাথে হরিণের মিতালি গড়ে উঠে।

প্রবাদে সংস্কৃতি

সম-√কৃ+ক্তি = সংস্কৃতি। 'সম' অর্থাৎ সম্যক বা সুন্দর। জীবনচর্চার জন্য যা কিছু সুন্দর এবং সুসামঞ্জস্য করার প্রয়াস তাই হল সংস্কৃতি। ইংরাজি Calture শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. ক্ষিতিমোহন প্রমুখেরা বাংলায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সমাজ-জীবনের যা কিছু চর্চিত আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-উৎসব, রীতি-নীতি সবই সংস্কৃতির অন্তর্গত। বস্তুতঃ শুভাশুভ বোধ থেকেই বিশ্বাসের জন্ম এবং আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে সংস্কৃতির রূপ নেয়। সমাজে জীবন-যাপন করতে গেলে এই সকল প্রচলিত সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিগুলিকে চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। তবেই আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে ভবিষ্যতের পথে চালিত করতে পারব। তাতে একটা গোটা সমাজ যেমন রক্ষা পায়, তেমনি একটি সম্প্রদায়ের জীবনধারা গুলিও বেঁচে থাকবে যুগ-যুগান্তকাল। এই সংস্কৃতি গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থা, নিরক্ষর, নিচুতলার অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় শহরের উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও পরিলক্ষিত। আলোচ্য প্রবাদগুলিতে আমরা তার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ করি। প্রবাদগুলির মধ্যেই আমরা প্রাচীন সংস্কৃতির রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করতে পারি। বলা যায় একটি গোটা সমাজ-সংস্কৃতির জীবন্ত চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে

ওঠে। প্রবাদে এই সংস্কৃতির ছাপ দেখা যায় নিত্য দিনের খাওয়া, পরা, জীবিকা, বাসস্থান, কর্মস্থান, ধর্ম, বিধি, সামাজিক, পারিবারিক গন্ডীর মধ্য দিয়ে।

প্রবাদ	পূজা/ পরব	সময়	দেব-দেবতা	স্থান	আচার-আচরণ /সংস্কৃতি ও প্রবাদ
রাবন মাইরব্য না কাইটব্য তখে।	রাবন কাটা	আশ্বিন মাস। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা।	দুর্গা	দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণ।	লাল কালো সাদা বাঁন্দরের মুখোশ ও পোশাক পরিহিত "রাবন কাটা জুডুম জুডুম" বলে নৃত্য পরিবেশিত হয় লাগড়া সহযোগে।
চাঁউড়ি বাঁউড়ি মকর এখ্যান সেখ্যান সাঁই সুই / তার পদ্দিন আসবি তুই।	মকর	পৌষ সংক্রন্তি	টুসু	প্রত্যেকটি গৃহে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।	পিঠে পরব -- গ্যাড়গ্যড়্যা, দুধপিঠা, ভাজা পিটা, বিভিন্ন ধরণের পিঠে খাওয়ার রীতি।
আই আই মা মন্সা / তোর চরণে গড়।	ঝাপান	শ্রাবণ	সাপ	শুশুনিয়া, বিষ্ণুপুর	বাঘের পিঠে চেপে সাপের খেলা, পান্তভাত খাওয়ার রীতি।
কুথাউ কিছু নাই / ইন্দ পরবে দুগ্‌গা পূজা।	ইন্দপরব	ভাদ্র		খাতড়া, বিষ্ণুপুর (রাজাদের পুজো)	ইন্দ কাঠ পুজো করে পুকুরে পুঁতে দেয়।
বিসণুপুরের ভাদু তুমি / খুঁজগ তুমি ঝাড়ের আল।	ভাদু পরব	ভাদ্র	ভাদু	বাঁকুড়ার প্রান্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।	ভাদু গান।
টুসু আমার মা গ / আলতা পরা পা	টুসু পরব	পৌষ	টুসু	বাঁকুড়ার প্রান্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।	টুসু গান।
এ্যাকেই মা মনসা তার উপর ধুনার গন্দ	মনসা পরব	শ্রাবন মাসের পঞ্চমী	মনসা	বাঁকুড়ার প্রায় সর্বত্র স্থানে মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠিত।	মন্দিরে মাটির তৈরি মনসাদেবীর মূর্তি বা মাটির তৈরিসর্পের আকৃতি হয়ে থাকে। তাছাড়া মাটির হাতি ঘোড়ার মূর্তি গাছের তলায় স্থাপিত হয়।
শিয়াল গেল্য খালে / শুগনি গেল্য ডাল্যে।	শিয়াল শুগনি পূজা	আশ্বিন মাস	জীমূতবাহন	বটতলা।হাতির উপর ছাতা মাথায় দিয়ে মাটির তৈরি	মাটির তৈরিশিয়াল এবং শুগনির মূর্তি জলে ছুড়ে এক ডুবে শশার কামড়

				মূর্তি স্থাপন করা হয়।	খেতে হয়।
বিসনুপুরের মেল্যা / যাব্য দুফুর বেল্যা	বিষ্ণুপুর মেলার	৭-১১ই পৌষ	মদনমোহন সহ অন্যান্য বিষ্ণু দেবতা	বিষ্ণুপুর : কলেজ রোড	কুটির শিল্প / বিভিন্ন হস্ত শিল্প, লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি পরিবেশিত হয় মেলায়।
কখনো নাই ভাজা খুঁজা / মিন পরবে দুগ্‌গা পূজা।	খইঢার‍্যা	শ্রাবন	মনসা	মন্দির	পুজো দিয়ে দই, খই, চিড়া,হলুদ মুড়ি, বাদামবাজা, তেলে ভাজা খেয়ে সারা দিন কাটাতে হয়।
খড় জ্বালে সরুচুকলি, মন্দা জ্বালে আঁশকে / আঁশকে খেয়ে ফোর গুনবি, নইলে যাবি ফসকে।	খিরপিঠ্যা	ভাদ্র মাসের মঙ্গলবার	মনসা	মন্দির	সারাদিন সরুচুকলি পিঠে খেয়ে কাটাতে হয়।
যার ঘরে মাড়ুলি / তার ঘরে পদধূলি।	ঘাঁটু	ফাগুন মাসের শেষ সংক্রান্তি	ঘন্টকর্ণ	দুয়ারে (ঠিক চৌকাঠের নিচে) গোবরের মাড়ুলি দিয়ে তার উপর ভাঙা হড়ির টুকরোতে ঘেঁটু অবস্থান করে।পূজোর পর ঠাকুর ঘরে রাখা হয়। একমাস পর বিসর্জন হয়।	হাতে নির্মিত তিনটি গোবরের গোলাকার টুকরো একসাথে হলুদ সুতোয় বাঁধা থাকে। চোখ হিসাবে তিনটি কড়ি বসানো হয়। ঘেঁটু ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। ভোর বেলায় পুজো শেষে হাড়ি ভাঙা হয়।

বিয়াই খ্যায়্যেঁ ল্যে খ্যায়্যেঁ ল্যে / নতুন ধান্যের চিঁড়্যা / আগলি ধারে জল ঘটিটা / পিছলি ধারে পিঁড়্যা। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর,বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি,বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পোঃ ছাতনা, ব্লক-ছাতনা)।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসবের সময় নতুন ধান ওঠে। সেই সময় নব বিবাহিতা কন্যার পিতাকে বাঙালি পরিবারের রীতি অনুযায়ী আমন্ত্রণ জানানো হয়। নতুন ধানের সুগন্ধি চিঁড়া আহার করতে দেওয়া হয়। আগে জলের ঘটি এবং পিছনে বসার জন্য পিঁড়ির আয়োজন করা হয়। গ্রাম বাংলায় নিত্য বছরের একটি অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে অতিথি আমন্ত্রণ ও আপ্যায়ণের বিশেষ রূপটি চোখে পড়ে।

চলিনন্যা তুই হাত লাড়্যি / হাত্যে দুব ধূলাবাইন মাইর্য্যি। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)।

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র, প্রবাহমান কাল ধরে চলে আসছে। মানুষের স্মরণে ও মননের উপর দাঁড়িয়ে আছে অগাধ-অপরিসীম বিশ্বাস। প্রবাদটি অহংকারী নারীর উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অহংবোধ না সহ্য করতে পেরে বলেছে 'ধূলাবাণ' মেরে তার হাত অবশ করে দিতে পারে। 'ধূলাবাণ' হল এমন এক মন্ত্র যে, মন্ত্রের দ্বারা মানুষকে বশীকরণ করা যায়। যে কোন অঙ্গের ওপর ধূলো ছুঁড়ে অবশ করা যায়।

বিসনুপুরের ভাদু তুমি / খুঁজগ তুমি ঝাড়ের আল। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি, বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পোঃছাতনা, ব্লক-ছাতনা)

বিষ্ণুপুরে ভাদ্র মাসে বিখ্যাত ভাদু পরব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ার সকল গ্রামের লোকেরা বিষ্ণুপুরের ভাদু পরব দেখতে আসত। যদিও প্রত্যেক পরিবারে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাদু পরবে ঝাড়ের আলো ছাড়া অনুষ্ঠানটি অসম্পূর্ণ। ভাদু ভাসানের দিন মিছিল করে ঝাড়ের আলো, রোশনায়, বাদ্য-সানাই পরিবেশিত হতো। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ঐ দিন লোকে লোকারণ্য হয়। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার যুগে বিষ্ণুপুরে ঝাড়ের আলো সহযোগে প্রাচীন উৎসবটি আর চোখে পড়ে না। যদিও গ্রামে-গঞ্জে এখনও ভাদু পূজা যৎসামান্য আয়োজন করেই পূজা শেষ হয়। ঝাড়ের আলো হল ঝাড়বাতির মতো দেখতে তেলের সলতে সহযোগে আলো জ্বালানো হয় (যেমন স্টোভে পাম্প দিলে আলো জ্বলে ওঠে)।

আমরা মায়ের সাত বিটি / সাতটি সোনার মাদুলি / বিটি পাঠাবি শউর বাড়ি / শউর বাড়ি অনেক ধূর‍্যে / আমি যাব্য ঘুর‍্যে ঘর‍্যে । (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

গ্রাম বাংলায় সমাজ রক্ষার্থে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হয়। কারণ চিরদিন কন্যাকে বিবাহ না দিয়ে বাপের বাড়ি রাখা মানেই সমাজচ্যুত হবে। কিন্তু মা-মেয়ের সম্পর্ক চির মধুর, চির আদৃতের বন্ধন। মায়ের কাছে তার সাত কন্যা রাজকন্যার সমান। কন্যারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে অতি যত্নে, পরিচর্চার সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। সমাজের কাছে কন্যা অবহেলিত হলেও মায়ের কাছে এক একটি সোনার পুতুল। এই অন্তঃস্থলের কথাটি মা-মেয়ের মধ্যে চির-ফল্গুধারায় প্রবাহিত। তাই কন্যা অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে শ্বশুর বাড়ি যেন অনেক দূরে হয় এবং ফিরে যেন না আসতে হয় বাপের বাড়িতে। তবেই মায়ের টান ছিন্ন হবে, শ্বশুর বাড়িতে মন দিয়ে সংসার করতে পারবে।

তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী সমাজের মুখ রক্ষার্থে কন্যাকে পাত্রের হাতে তুলে দিতেই হতো না হলে সমাজের কাঠগোড়াই দাঁড়াতে হতো সেই পরিবারকে।

যে দিনছ্যে সিতার সিঁন্দুর / সে আস্যে নাই লিত্যে / আমার রং লাগে নাই যেত্যে। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

বিবাহ অনুষ্ঠানে রীতি মেনে সিঁন্দুর সম্প্রদান সহ বিভিন্ন আচার-আচরণ পালন করা হয়। জামাইয়ের হাতে কন্যার সমস্ত ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয় পিতা। নতুন সংসার জীবনে স্বামীর প্রতি অভিমানে নববধূ বাপের বাড়ি আসে। মান-অভিমানের শেষ পালায় নববধূর ইচ্ছে স্বামী এসে তাকে শ্বশুড়বাড়ি নিয়ে যাক। কারণ, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সমাজকে সাক্ষী করে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। তাই স্বামী ছাড়া শ্বশুড়বাড়ির লোক কন্যাকে নিয়ে যেতে চাইলে অনুরাগ বশত কন্যার ক্ষেদোক্তি প্রবাদটিতে ধরা পড়েছে।

আঁড়স্যা খ্যাঁইছ্য আঁড়স্যার ফর গুনুস নাই। (কাজল ঘোষ, বয়স-৪০, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে ইঁয়োতি বা ইতু বিসর্জনের দিন প্রসাদ হিসাবে আঁড়স্যা বা আঁশকে পিঠে বানানো হয়। চালের গুঁড়ো দুধ-নারকেল সহযোগে ঊনুনের জ্বালে বাটির আকারে মোটা মোটা পিঠে তৈরি হয়। মিশ্রণটি ডাবুতে নিয়ে তাওয়ায় দেওয়ার পর ঢাকা দেওয়া হয়। সেদ্ধ হওয়ার সাথে

সাথে পিঠেতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হয়ে থাকে। যে ছিদ্র অগুন্তি বা গোনা যায় না। আলোচ্য প্রবাদটিতে রঙ্গ-রসিকতা করে আহার রত ব্যক্তিকে বলা হয়েছে পিঠে খাওয়ার সাথে সাথে পিঠের ফোর বা ছিদ্র সম্পর্কে জানা উচিত।

জামায়ের নামে মাইরল্য হাঁস / ঘর গুষ্টি খেল্যেক মাস। (বিনা কেওড়া, বয়স-৪৫, পোঃ দুর্লভপুর, ব্লক-গঙ্গাজলঘাটি) জামাইয়ের লেগ্যে কাইট্যে হাঁস / সবাই মিল্যে খ্যাঁই মাঁস। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

'জামাই খাতির' এর রেওয়াজ বহু পুরানো রীতি তা এখানও গ্রাম-গঞ্জে বা শহরাঞ্চলে পরিদৃশ্যমান। গ্রাম বাংলায় 'জোড় ভাঙ্গার' নিয়ম অনুযায়ী অষ্টমঙ্গলায় জামাই, সমস্ত পরিবারকে মাংসভাত খাওয়ায়। ঘরগুষ্টি বা সমগ্র পরিবার আনন্দের সাথে হাঁস মাংস আহার করে। 'মাস' অর্থাৎ মাংস। আলোচ্য প্রবাদটিতে তৎকালীন সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের কথা ফুটে উঠেছে।

এসো কুটুম বসো খাটে / পা ধুয়ো গা গোড়ের ঘাটে। (রবীন্দ্রনাথ সীট, বয়স-৭৫, নিরক্ষর, পাহাড়পুর, ব্লক-বড়জোড়া)

গ্রাম-গঞ্জে অতিথি আপ্যায়ন রীতিটি এখনও বর্তমান। গ্রাম বাংলার সহজ-সরল মানুষের কাছে অতিথি এবং দেবতা এক। আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়ণে যাতে ত্রুটি না হয়, তার জন্য বাড়ির সদস্যরা সদা ব্যতিব্যস্ত। অতিথি গৃহের প্রবেশ দ্বারে ঢোকার পূর্বে পা ধোয়ানোর একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত। তারপর অতিথিকে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়িতে কোন অপছন্দের (বিরাগ ভাজন) কুটুম বা অতিথি বাড়িতে এলে তাকে কথার ছলে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত দেয়। তা প্রবাদের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয় যে, কুটুম বাড়িতে প্রবেশ করার পূর্বে পা ধোয়ানোতো দূরের কথা তাকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, "পা ধুয়ো গা গোড়ের ঘাটে" বলে ।

তুলুস তলায় দিয়ে বাতি / পুরান ঢ্যামন হয়েছে সতী। (হিরারানি মন্ডল, বয়স-৭০ বিধবা, নিরক্ষর, পাহাড়পুর, ব্লক-বড়জোড়া)

সংস্কারী হিন্দু পরিবারে দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসি তলায় সন্ধে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। একজন সংস্কারী শুদ্ধসত্ত্বমতি বধূর এটি নিত্য কর্ম পূজা। গৃহের কল্যাণ কামনায়, স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যেই দেবতার নিকট সন্ধ্যে প্রদীপ নিবেদন করে। কিন্তু যদি কোন নারী বিবাহ পূর্ববতী বহু পুরুষদের (বহুগামী) নিয়ে মজে থাকে। অথচ বিবাহ পরবর্তী স্বামীর

কল্যাণ কামনায় সন্ধ্যে প্রদীপ বা বাতি, তুলসি স্থানে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। তখন তা পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ঘটনাক্রমগুলি চক্ষুর গোচরে আসে এবং প্রতিবাদ করে ওঠে। যে নারী একসময়ে অন্যের ঘর-সংসার ভাঙাই মগ্ন থাকে সেই নারীই কু-কর্ম গুলি ভুলে গিয়ে নিজ সংসারের শান্তি ফেরাতে সতী হয়েছে।

একই সিঁন্দুর সবাই পরে / কপাল গুনে ঝিলিক মারে। (সুভদ্রা দে, বয়স-৫৭, গৃহবধূ, মির্জাপুর, ব্লক-কোতুলপুর)

স্বামী সোহাগী নারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কারণ তার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে। স্বামী–সন্তান নিয়ে শান্তিতে সংসার করছে। হিন্দু গৃহস্থ এয়ো নারী স্বামীর কল্যাণ কামনায় নিত্য দিন সিঁথিতে সিঁন্দুর পরে। স্ত্রীর বিশ্বাস তাতে স্বামীর আয়ু দীর্ঘ হয়। সেই নারীই সৌভাগ্যবতী যে স্বামী নিয়ে শান্তিতে বসবাস করে। স্ত্রীর কপালের জোরে, সিন্দুরের চমকে সংসার জীবন সুখী হয়েছে।

ব্রাহ্মণকে গরু দান এক চোখ তার কানা / ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদান সহস্র তাঁতে বোনা / ব্রাহ্মণকে জমি দান ছিটকুড় তার মানা। (অলক দে, বয়স-৫৮, প্রাইমারী টিচার, মির্জাপুর, ব্লক-কোতুলপুর)

হিন্দু ধর্মানুসারে পূজা বা উপনয়ন বা অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে গো-বস্ত্র-জমি দান করতে হয়। দানের মধ্য দিয়ে কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়, কখনো বা পূণ্য অর্জিত হয়। সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা-পাপ ধৌত হয়। কিন্তু সে দানে যদি খোঁটা বা খুঁত থাকে তবেই ব্রাহ্মণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আর ধর্ম-সংস্কারের ভয় দেখায়, পাপের ভয় দেখায়। ব্রাহ্মণ তার দানে তুষ্ট না হয়ে উদৃষ্ট ব্যক্তিকে অপমান করে বলে কানা গরু দান বা সহস্র তাঁতে বোনা বস্ত্র বা ছিটকুড় জমি, এগুলি সব দানের যোগ্য নয়। বস্তুতঃ বর্তমানে বর্ণ-বৈষম্য দূর হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের প্রাধান্য লুপ্ত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অর্থাৎ প্রবাদে ব্রাহ্মণকে হেয় করা হয়েছে।

মা গ মা তোর জামাই এসেছে / চিংড়ি মাছের খালায় করে গয়না এনেচে / ঐ গয়না লুব নাই দিদির বিয়া দুব নাই। (আরতি বাজ, বয়স-৮০, নিরক্ষর, বিধবা, খাটুল, ব্লক-জয়পুর)

হিন্দু সংস্কার মতে, বিবাহ পরবর্তী হিন্দু রমনী শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে, বাপের বাড়ি পর হয়ে যায়। আর শ্বশুরবাড়ির সবাইকে আপন করে নিতে হয়। দীর্ঘদিন পর দিদি বাপের বাড়ি এলে ‘দিদি-ভাই’ এর মিলন হয়। নাবালক ভাই, দিদিকে হাত ছাড়া করতে নারাজ। জামাইবাবু দিদিকে নিতে এলে

ভাই অভিমানে দিদির জন্য আনা বহুমূল্যের অলংকার ফিরিয়ে দেয়। তার বিনিময়ে দিদিকে বাড়িতে চিরদিন বন্দি করে রাখতে চাই। ছোট ভাই ও দিদির স্নেহ মিশ্রিত মধুর সম্পর্কটিকে তুলে ধরা হয়েছে। 'বিবাহ' নামক সংস্কার রীতিটি ভাই-দিদির মধুর সম্পর্কটিকে বিচ্ছিন্ন করেছে তারই প্রতিফলন পায় প্রবাদটিতে।

আর কি গোদের ভয় আছে / কুসুম ডিঙ্গা পার হয়ে গেছে। (মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, বিধবা, শ্যামবাজার, মাইতকার্ত্তিক পাড়া, ব্লক-সোনামুখী)

সে নারী হোক বা পুরুষ ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী, হিন্দুর বিবাহ একবারই হয়। কিন্তু শরীরে খুঁত থাকলে বিবাহ যোগ্যা নারীর বিবাহ পরিণতি পায় না। যেহেতু কুসুমডিঙ্গা পার হলে আর বিবাহ ভাঙা সম্ভব নয় সেহেতু, সমাজ রক্ষার্থে পিতা-মাতার কারছুপিতে (শরীরের খুঁত গোপন করে) বিবাহ আসরে টেনে আনে মেয়েকে। এবং বিয়ের রাত্রির পর সকাল বেলায় কুসুমডিঙ্গা বা সিন্দুর দান রীতি সম্পূর্ণ হলে মেয়ের বাড়ির লোক নিশ্চিন্ত হয়। এবং চিরদিনের জন্য কন্যার ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিতে হয় জামাইকে। এটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিবাহ রীতি। কুসুমডিঙ্গা হল বিয়ের পরদিন সকাল বেলায় যজ্ঞ করে সিন্দুর দান হয়। এই সিঁন্দুর দান রীতিতেই বিবাহ পূর্ণতা পায়।

মাইতো কাত্তিকের হাতে ঘড়ি / বড় কাত্তিকের গলায় দড়ি। (মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, বিধবা, শ্যামবাজার, মাইতকার্ত্তিক পাড়া, ব্লক-সোনামুখী)

সোনামুখী ব্লকে কার্ত্তিক মাসে 'কার্ত্তিক পূজা' বিখ্যাত। প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় কার্ত্তিক পূজার সমরোহ দেখা যায়। ঐ দিনগুলিতে প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এ পরিপূর্ণ হয়। ভাসান অর্থাৎ ঠাকুর বিসর্জনের দিনই প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে। 'বাজারের বড় কার্তিক'এর তুলনায় 'মাইতো পাড়ার কার্ত্তিক' সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশেষ্ঠ প্রমাণের জন্য তাসা, শিঙ, বাজনা সহযোগ নাচ করে,হাতে ঘড়ি পরিহিত (কার্তিক ঠাকুরের হাতে থাকে ঘড়ি) কার্তিক ঠাকুরের বিসর্জন হয়।

ছাপা শাড়ি লাল ব্লাউজ মকর ডুব দিত্যে / গাঁন্দাফুলের মালাবদল মাকড়ার ড্যাঙগেত্যে। (সুদর্শন সেনগুপ্ত, বয়স-৬২, পেশা-হোমিওডাক্তার (প্রাকটিস), উচ্চমাধ্যমিক পাশ, গোপালপুর, মালিয়ান, ব্লক-হীড়বাঁধ)

মাকড়ার ভাইঙ্গেতে মকর ডুব দিয়ে ছাপা শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরিহিতা নারী সকলের অগোচরে তার ভালবাসার পাত্রকে বিবাহ করে। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানে 'গাঁন্দাফুলের' মালাবদল হয়

না। কিন্তু যেহেতু বাড়ির অমতে বিবাহ তাই গাঁন্দাফুলের আয়োজনই মালাবদল সম্পূর্ণ হয়। সামাজিক রীতি-নীতি না মেনে গোপনে যে নারী প্রেম-প্রণয় করে বিবাহ করে সেই নারীকে ব্যঙ্গ করে উক্ত প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে।

কইন্যা দেইখ্যে যাও কইন্যা দেইখ্যে যাও / কনক চাঁপার ফুল / বর দেইখ্যে যাও বর দেইখ্যে যাও / রান্নাঘরের ঝুল। (দুলাল মন্ডল,জোৎস্না মন্ডল, নিরক্ষর, গ্রাম-মন্ডলকুলী,ব্লক-রাইপুর)

বিবাহ অনুষ্ঠানের বরযাত্রী আগমনের পর কনের বান্ধবীদের বা শালীদের মজা করার রীতি বা ঠকানোর রীতিটি প্রচলিত। কনের বাড়ির লোক বরকে ইচ্ছে করে হেয় করে। মজা করে কনেকে কনক চাঁপার ফুলের সাথে তুলনা করে অপরদিকে বরকে রান্না ঘরের ঝুলের সাথে তুলনা করে এই ঠাট্টা বা মসকরা করার রীতিতে উভয় পক্ষের লোকই আনন্দ পায়।

কইন্যা ঘরের সব কইন্যা যাত্রী / আছে সারিসারি / যার হাতেত্যে কাজললতা / তাখেই বিয়া করি। (ভবানী মন্ডল,বয়স-৫০,অষ্টম শ্রেনী,মন্ডল পাড়া, ব্লক-রাইপুর)

প্রবাদ ও ছড়া এখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর হাসি-ঠাট্টা-মসকরার মধ্য দিয়ে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কনেকে চিনে নেওয়ার পালা। সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা কনের বান্ধবী বা কনের বোন, জামাইবাবুকে মজা করার পর প্রত্যুত্তরে জামাইবাবুও বলে ওঠে – ‘যার হাতেত্যে কাজললতা তাখেই বিয়া করি।’ প্রথা অনুযায়ী বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কনেকে নিজের কাছে কাজললতা রাখতে হয়। যাতে অশুভ কোন শক্তি ছুঁতে না পারে।

যদি জানথম হিং দিয়ে রাইনথ্যম। (হরিমতি দেশমুখ, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, বহড়ামুড়ি, ব্লক-খাতড়া)

তৎকালীন হিন্দু বাঙালিদের অতিথি আপ্যায়ণের একটি বিশেষ রীতি ফুটে উঠেছে। প্রতিদিনের রান্নার বাইরে স্বাদ ও গন্ধের একটু ভিন্নতা আনার জন্য হিং দিতে ভুলে যেত না। দরিদ্র পরিবারে অতিথিদের পোলাও ও কোর্মা খাওয়াতে না পারলেও, স্নেহ ভালবাসা মিশ্রিত হস্তে হিং দিয়ে রান্না করতে পিছপা হয় না। বস্তুতঃ প্রবাদটিতে হঠাৎ আগমনরত অতিথির উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে।

এত ট্যাকাই বিয়া দিলি বুড়া বরে / বুড়ার সঙ্গে যেত্যে হব্যেক নদীর ধার‍্যে ধার‍্যে। (সাবিত্রী মন্ডল, বয়স-৫৫, নিরক্ষর, গৃহবধূ, মন্ডলকুলী, ব্লক-রাইপুর)

তৎকালীন সমাজে কৌলীন্য প্রথার কথা ফুটে উঠেছে প্রবাদটিতে। সমাজ রক্ষার্থে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে সু-পাত্র বা কু-পাত্রের হাতে সমর্পণ করতেই হত। তৎকালীন সমাজে পণপ্রথার একটি বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। দরিদ্র পিতাকে টাকার বিনিময়ে পাত্রস্থকরতে হত বুড়ো বরের সাথে। তৎকালীন সমাজের পণ প্রথা এবং কৌলীন্য প্রথার এই ভয়ঙ্কর দুটি কু-প্রথার কথা আমরা প্রবাদের মাধ্যমে জানতে পারি।

অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় অবস্থান রাজনৈতিক অবস্থা, পরিবার ছাড়াও সামজিক পরিকাঠামোর অপর এক অঙ্গ জীবিকা। অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসের সাথে সাথে গড়ে ওঠে শ্রম বিভাজন। সমাজস্থ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা বিভিন্ন কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, যদিও স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগ পৃথক পৃথক। বেশিরভাগ নারীরা গৃহস্থের হালকা কাজ করে বা গৃহে উপস্থিত থেকে উপার্জনক্ষম কর্ম করে থাকে। অপরদিকে পুরুষেরা গৃহের বাইরে ভারী কাজকর্ম করে থাকে। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন সমাজে জাতিগত বা বর্ণগত বৈষম্যের উপর নির্ভর করে পেশা। কৃষক-চাষ, তাঁতি-তাঁতের কাজ, কুমোর-মাটির কাজ, কামার-পেতলের বা লোহার কাজ, ছুতোর-কাঠের কাজ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কাজ, মুচি-চামড়ার কাজ, হাঁড়ি-বাউরি-ডোম-হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, শূয়োরের চাষ বা মদ বিক্রি, মেথর-শৌচাগারের কাজ, জেলে-মাছের ব্যবসা, গোয়ালা-দুধ বিক্রেতা ইত্যাদি। আধুনিক সভ্য সমাজ জাতিভেদ প্রথাকে তুচ্ছ করে অর্থনৈতিক অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছে। লাভ ক্ষতির গুরুত্বের উপর বিচার করে শ্রমের কর্ম নির্ভর করে। যেমন একজন ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষ ধরে পৌরহিত্যের কাজ করে আসছে কিন্তু দৈনন্দিন সময় ও জীবন পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারি বা বেসরকারি চকুরিজীবী বা চাষ-আবাদও করতে পারে। আবার হাঁড়ি বা ডোম নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী হতে পারে। তারা তখন সমাজের স্তর ভেদে উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করবে। অপরদিকে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণীর মানুষও ছোট-খাট ব্যবসা করতে পারে। নিম্নবিত্ত মানুষও কায়িক শ্রমের দ্বারা উচ্চস্তরের সরকারি চাকুরি জুটিয়ে ফেলতে পারে। অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায় কায়িক শ্রমের দ্বারা যে কোন পেশায় নিযুক্ত হতে পারে।

জাতিগত অবস্থা

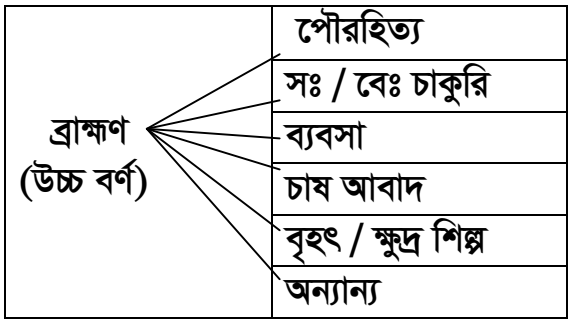

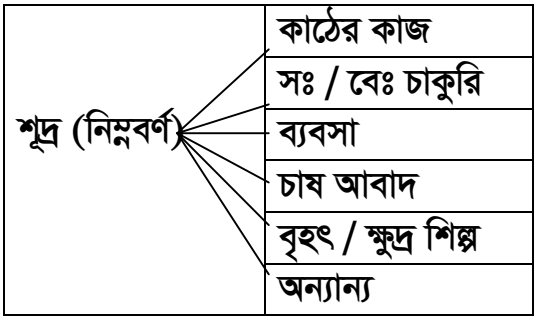

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন

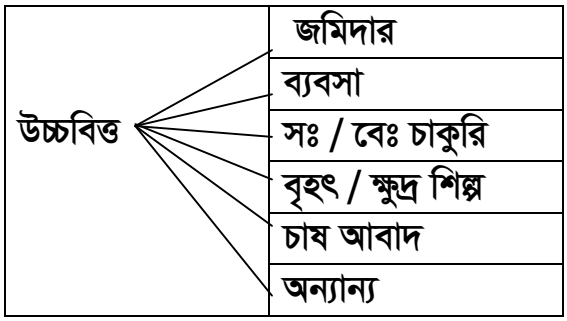

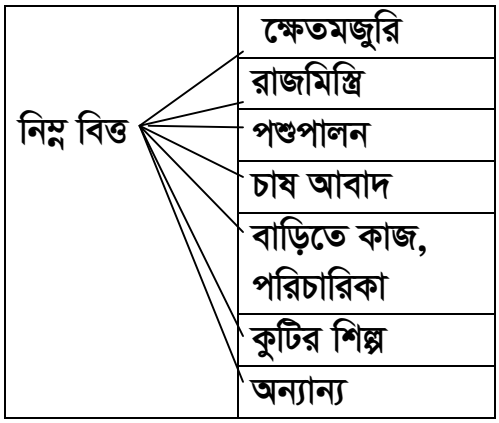

যদিও গ্রামের প্রান্ত স্থানে এখনো জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথাটি পুরোপুরি লুপ্ত হয় নি। প্রবাদে আমরা সেই পেশাগত বিভাজনটি লক্ষ্য করতে পারি। প্রবাদে তা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে কারণ, প্রবাদ সমাজ জীবনের দর্পণ, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

ক্র.	ব্লকের নাম	Main Worker বা প্রধান কর্মী		Marginal Worker বা প্রান্তিক কর্মী		Non Worker বা অপরিশ্রমী কর্মী	
		মহিলা.-	পুরুষ.-	মহিলা.-	পুরুষ.-	মহিলা.-	পুরুষ.-
১	শালতোড়া	৫২৪৯	২৬৮৫৮	৯৯২৬	১২৩০২	৫১০৭৩	৩০৫৭২
২	মেজিয়া	২২৯২	১৭৬৯৩	৩২৩৪	৭২২০	৩৬০৮৭	১৯৬৬২
৩	গঙ্গাজলঘাটি	৪৭২৭	৩২৩৭৮	১২৭৭৭	১৯৪০৯	৭০২১৮	৪১৪৬৫
৪	ছাতনা	৬০৮৩	৩৪১২৯	১৬৬৩৯	২০৩৬১	৭২৭৯৩	৪৫০৩৩
৫	ইন্দপুর	৫৪৯৪	২৫৮৩০	১৩৭৫৬	১৮৩২৩	৫৬৭১৬	৩৬৪০২
৬	বাঁকুড়া-১	৪৫৯৯	২৫০৯০	৪৮৯২	৫৭৪৬	৪৩১১৫	২৪২৪৩
৭	বাঁকুড়া-২	৪৯৫৮	৩০৬৩২	৬৭৪৩	১০১৯২	৫৬৮৬১	৩১৪৭৮
৮	বড়জোড়া	৭৫০১	৪৫৪৪৭	১১৩৬৪	১৪৭৯৫	৭৯৪১৫	৪৩৫২৭
৯	সোনামুখী	১২০৭২	৪১৩৪২	১১২৬৯	৭৮৯৮	৫৩৭৪৬	৩২৩৭০
১০	পাত্রসায়ের	১১২৪৫	৪৬৯৯৯	১১৫০৫	৯৬৭০	৬৭৭০৬	৩৬৯৪৫
১১	ইন্দাস	৬০৫৪	৩৮৭৮৫	১০০৪৮	১৩৯৭৫	৬৬৯৮৪	৩৩৯৩৭
১২	কোতুলপুর	৭৪২৫	৫০১০২	১১৯৬৪	৮০৬৮	৭২৯৯২	৩৮২২৪
১৩	জয়পুর	৫৫০০	৩৮৭৯৪	১০৮৭৮	৮৯৪২	৬০৪০৪	৩২৪০২
১৪	বিষ্ণুপুর	৮০৪২	৩৫৭২০	১২৮০৩	১০৫৯১	৫৬০৩৬	৩৩৬৩০
১৫	ওন্দা	১১৩৭৭	৫৮১৬৩	১৫১৪১	১৫৩০৩	৯৭২১৮	৫৫৭৮২
১৬	তালডাংরা	৭২৮৯৪	৭৪৯৯৯	১৪৬৬০	১৩৬৬৫	৫২৯১৮	৩২৫৬২

১৭	সিমলাপাল	৭০০৩০	৭৩০০৮	১১৯৬৩	১৫৩০৪	৫২০৩৪	৩৩০৫৬
১৮	খাতড়া	৫৬৯৪২	৬০০৫৮	৮৬২০	১১৫৬৫	৪৩৬০২	২৭৯৮৭
১৯	হীড়বাঁধ	৪০৯১৭	৪২৯১৭	১০০৪৯	১১৯০৫	২৭৬৫৫	১৮৭০৯
২০	রানিবাঁধ	৫৮৭৯৯	৬০২৯০	১৬৭৫১	১৩৩০৩	৩৫৮৯০	২৫৭২৬
২১	রাইপুর	৮৪০৩৮	৮৭৩৩৯	২০০৭৩	২০৬২৯	৫৫৭৬০	৩৭৩৮৪
২২	সারেঙ্গা	৫২৬৪০	৫৪১৬৮	১০৭৪৫	১২৫১০	৩৭৪৮৩	২৪৩১০

২০১১ সালের আদমশুমারি এবং ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, প্রথমতঃ বেকারত্বের সংখ্যা বা Non worker সংখ্যা বেশি। দ্বিতীয়তঃ নারীর তুলনায় পুরুষের উপার্জন ক্ষমতা বেশি। তৃতীয়তঃ যে সমস্ত Main worker তারা কলকাতা বা বাঁকুড়ার বাইরে বসবাস করে। ব্লকের প্রধান বাজার গুলিতে (বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সুলভ) ব্যবসায়ীরা বসবাস করে। রাস্তার ধারে দু-পাশে সারি সারি দোকান গড়ে উঠেছে, সবজি বাজার বা মাছ বাজারও দেখা যায়। প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে সপ্তাহিক হাট-বাজার বসে। চাষবাস সেখান কার মূল জীবিকা। তাছাড়া পশুপালন, ক্ষেত-মজুর, ঠিকা-মজুর, কুলি-মজুররে কাজ করে থাকে। বাঁকুড়ার হস্তশিল্পটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়---শালপাতার থালা, তালপাতার পাখা, খেজুর পাতার ঝাঁটা, মাদুর, লণ্ঠন, উনুন, ইঁন্দুর জাত, কাঠের কাজ, শাঁখের কাজ, বেতের ঝুড়ি, মাছের জাল তৈরী, তাঁতের কাজ, হাতের তৈরী বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজাবার সৌখিন জিনিসপত্র যেগুলি Non worker এর মধ্যে পড়ছে যা নিম্নবৃত্ত মানুষের জীবিকা। দু-একটি বৃহৎ শিল্প ছাড়া বাঁকুড়া অঞ্চলে কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। ক্ষুদ্র ব্যবসা, চাষবাস, পশুপালন ছাড়া মূল উপজিব্য জীবিকা হল - মাছ ধরা, কাপড় বোনা, রাজমিস্ত্রির কাজ, কাঠের কাজ, পৌরহিত্যের কাজ, লোকের বাড়ির কাজ ইত্যাদি। বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলিতে লক্ষ্য করা যায় 'C' বা 'D' গ্রুপের চাকুরিজীবী (এসডিও অফিস, বিডিও অফিস, বিদ্যুৎ দপ্তর, জল দপ্তর, বা অস্থায়ী কর্মী হিসাবে বর্তমান) ছাড়া উচ্চপদের চাকরি বা গেজেটেড পদের চাকরি সাধারণত স্থায়ী বাঁকুড়ায় লক্ষ্য করা যায় না। (যদিও বর্তমান ক্ষেত্রসমীক্ষায় উচ্চপদের কর্মচারী বা বিডিও অফিসার লক্ষ্য করা গেছে।) লক্ষ্য করা গেছে গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলে

Main worker গ্রামে খুবই কম। বেকারত্বের সংখ্যা বা Non worker অনেক বেশি গ্রামে প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে। শহর বা গ্রামে উভয়েই নারীর তুলনায় পুরুষেরা উপার্জন ক্ষম হয়ে থাকে। তালডাংরা, শালতোড়া সিমলাপাল, হীড়বাঁধ, রানিবাঁধ, রাইপুর, সারেঙ্গা অঞ্চলে র্থামাল পাওয়ার প্ল্যান্টের বৃহৎ কয়লা খাদান থাকায় মানুষ গুলি কর্ম দক্ষ। তুলনামূলক এই অঞ্চলের বেকারত্বেও হার বেশ চোখে পড়ার মতো। একই অঞ্চলে বৃহৎ বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর, ওন্দা, কোতুলপুর, জয়পুর অঞ্চলে প্রান্তিক কর্মীর (Marginal worker) সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

বাঁকুড়া জেলার জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তুলনামূলক এই অঞ্চলের চাষিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বড় শিল্প না গড়ে উঠলেও কৃষি নির্ভর মানুষেরা উর্বর জমিতে ধান, গম, যব, বিভিন্ন শাক সবজির চাষ করে থাকে প্রায় সারা বছর। বিশেষ করে কয়েকটি ব্লকের প্রান্ত এলাকায় উর্বর মাটিতে চাষ-আবাদই একমাত্র উপার্জনের পন্থা। নিম্ন-মধ্য-উচ্চ শ্রেণী বা হিন্দু মুসলিম যে কোন জাতি বা বর্ণের মানুষেরাই চাষ-আবাদ করে থাকে। বিভিন্ন ব্লকের প্রাপ্তি স্থান থেকে বিভিন্ন চাষ আবাদসহ অন্যান্য পেশার কথা প্রবাদের মাধ্যমে জানতে পারি।

য্যা এইল্য চষ্যে / সে রইল বস্যে / লাড়্যাকাট্যাকে ভাত দ্যাও / ঠেস্যে ঠেস্যে। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)।

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। রোপন থেকে শুরু করে বপন পর্যন্ত চাষিরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিত্যদিন মাঠেই কাটায়। চাষ-আবাদের পর ক্ষুধার্থ চাষিরা দু মুঠো অন্নের জন্য ঘরে ফেরে। ঠিক সময়ে অন্নের আয়োজন না করতে পারায় উত্তেজিত চাষি প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে – সে অন্ন সংস্থানের জন্য সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সম্মুখে খাবার পাচ্ছে না অথচ যে লাড়্যা কাট্যে (যে ঘরে বসে অত্যল্প কাজ করে) তাকেই তোয়াজ করে খাবার দিচ্ছে, তাদেরই খাবার আপ্যায়ণ করে খাওয়াচ্ছে। প্রবাদটি একজন পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্থ চাষি অপর অকর্মণ্য ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছে। 'লাড়্যা কাট্যাকে' অর্থাৎ যে খড় কাটে।

যদি চলে মনোহারী / কি করবেক জমিদারী। (ফেলু কাপড়ী, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, বীরসিংহ, নতুনগ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

প্রান্ত গ্রাম বাংলার রাস্তায় রাস্তায় সাইকেলে করে কাঁচের বাক্সে মনোহারী বিক্রি করে। এই ভাবেই একটি মানুষ রোদে পুড়ে, জলে ভিজে বাড়িতে বাড়িতে মনোহারী বিক্রি করে অর্থ উপাজন করে সংসার চালাই। কিন্তু এই কষ্ট করে জীবন-যাপন করলেও তাদের সংসারে নিত্য সুখ শান্তির অভাব হয় না। নুন্যতম রোজগারে তাদের পরিবার সুখী। সৎভাবে সারাদিন মনোহারী বিক্রি করতে পারলে আর কিছুর দরকার পড়ে না। জমিদার বা প্রতিপত্তি তাদের কাছে তুচ্ছ। দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সৎপথে কায়িক শ্রম করে বেঁচে থাকার আনন্দ অনেক মূল্যবান।

ঘেঁষা ঘেঁষি বাস / দেখা দেখি চাষ। (সুভদ্রা দে, বয়স-৫৭, গৃহবধূ, মির্জাপুর, ব্লক-কোতুলপুর)

উপযুক্ত আলো বাতাস যেমন বসবাসের পক্ষে উপযোগী, তেমনি অভিজ্ঞতালব্ধ চাষিরাও ফসল উৎপাদনে পারদর্শি হয়। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাষিরা, চাষবাসের উপযোগী আবহাওয়া-জলবায়ু-মৃত্তিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাই তাদের ফসল উৎপাদন লাভ জনক হয়। কিন্তু দেখা দেখি চাষ, অনভিজ্ঞ চাষির পক্ষে ক্ষতি। কারণ, ঘেঁষা ঘেঁষি (আলো-বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে) বসবাস যেমন অনুপোযুক্ত তেমনি অনভিজ্ঞ চাষও চাষিদের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

কোদালে কুড়ুলে মেঘ জমিলে / চাষিকে বলে বাগাগে হাল / আজ না হয় হবে কাল। (গণেশ সেন, বয়স-৫০ ঊর্ধ্বে, পেশা-চাষবাস, রায়পাড়া, ব্লক-ইন্দাস)

চাষের উপযোগী জমি করতে উক্ত যন্ত্রপাতির একান্ত প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, জলবায়ু। তাই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাষিরা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পেয়ে, পরদিন মাঠে নামার পরিকল্পনা করে। চাষিরা মেঘের অবস্থা দেখে অন্যান্য চাষি বন্ধুদের কোদাল-কুড়ুল এবং হাল 'বাগিয়ে' রাখার (প্রস্তুত করা বা গোছানো) পরামর্শ দেয়। বৃষ্টি পাতের পরদিনই মৃত্তিকা চাষযোগ্য জমি হয় তার কথা আমরা প্রবাদের মাধ্যমে জানতে পারি।

আল ভেঙ্গে জল যাচ্ছে / ভালুকে তালি মারছে। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, নিরক্ষর, গোয়ালাপাড়া, পোঃ বন-বীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের, ৭২২২০৭)

চাষের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত যেমন ফসল নষ্ট করে তেমনি অতিরিক্ত কম বৃষ্টিপাত ঠিক মতো ফসল উৎপাদিত হয় না। সুতরাং জমিতে আল বেঁধে জল ধরে

রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তা উপযুক্ত ফসল উৎপাদনের সহায়তা করে। মৃত্তিকা সর্বদা আর্দ্রিত থাকে। কিন্তু রেষারেষি পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বেশি দেখে হিংসা হয়। তাই জমির আল ভেঙে জল বেরিয়ে গিয়ে ফসল নষ্ট হচ্ছে দেখে, প্রতিবেশীরা আনন্দ প্রকাশ করে হাততালি দেয়। যখন একজনের ক্ষতি হচ্ছে দেখে অপরজন আনন্দ প্রকাশ করে তখন প্রবাদটি প্রতিবাদী কণ্ঠে বেরিয়ে আসে।

চাষ্যার চাকর চামচিক্যা / চাকরের নাম পাঁশশিক্যা। (ছবি ঘোষ, বয়স-৫০, নিরক্ষর, গৃহবধূ, বহড়ামুড়ি, ব্লক-খাতড়া)

গ্রাম বাংলায় চাষিদের উপার্জন আয়ের পরিমাণ অতি অল্প। মাঠের রোপন, বপন, জমি তৈরির জন্য কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন। ক্ষেত মজুরকে নিযুক্ত করতে হয় চাষের অতিরিক্ত কাজের জন্য। চাষিদের আয় থেকেই ক্ষেত-মজুরেরা ভাগ পায়। তাই তাদের অবস্থা দৈন্য থেকে দৈন্যতর। তারা কায়িক পরিশ্রম করেও কখনো কখনো অনাহারে কাটিয়ে দেয়। শরীর হয় জীর্ণ, কঙ্কালসার চামচিকার সমতুল্য। তাদের পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ন্যুনতম টাকার অঙ্কেও রাজি হয়ে যায়। কারণ, ঐসব অঞ্চলে চাষ-আবাদ করা ছাড়া কোন শিল্প নেই বা ব্যবসা করার উপযুক্ত পরিবেশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। তাই চাষের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় অধিকাংশ মানুষকে। প্রবাদে দরিদ্র ক্ষেতমজুরকে চাষার চাকর চামচিকা বলা হয়েছে।

যত দিন মাঠের ধান / খ্যায়্যেঁ লাও দক্তা পান। (নিভা হাজরা, বয়স-৫৫, জাতি-সদগোপ, পেশা-চাষি, হরিডিহি, গুন্নাথ, ব্লক-ইন্দপুর)

আবহাওয়া মৃত্তিকা জলবায়ু অনুযায়ী প্রতিবৎসর মাঠে সমপরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় না। অথচ ধানের উপরই একমাত্র ভরসা কারণ, বছরের মাত্র কয়েকটি মাস উচ্চমানের ফসল উৎপাদিত হয়। তাছাড়া অন্য সময়ে কোন ফসলের উৎপাদন বিশেষ লাভ জনক হয় না। উৎপাদিত আয়ের সঞ্চয়ে সারা বছর সংসার চালতে হয়। তাই ধান চাষ ভালো হলে চাষিদের আনন্দের সীমা থাকে না। অতিরিক্ত উপার্জনে আমোদ-প্রমোদ করে চাষিরা বড়লোকি চালে দক্তা পান খায়। কিন্তু ঐ দক্তা পান জুটে কেবল ধান চাষে লাভ হলে অন্য সময়ে মাঠ ও ধূ ধূ করে চাষির অর্জিত সঞ্চয়ও ক্রমশ ফাঁকা হয়।

রান্ধুনির সঙ্গে ভাব নাই / ভুজনে ভক্তি। (বন্দনা চন্দ, বয়স-৬০, নিরক্ষর, বাউরি পাড়া, ব্লক-কেঞ্জাকুড়া, বাঁকুড়া-১)

অন্যের বাড়িতে গিয়ে রান্না করা উপার্জনের আরেক পন্থা। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে, রাঁধুনির সঙ্গে ভাব না থাকলে রাঁধুনি আপন মর্জিতে রান্না করে। ভাব থাকলে তবেই ভাল ভাল পদ জোটে, রান্নায় উৎসাহ দেখায়। কিন্তু সম্পর্ক ভালো না থাকলে ভোজন রসিক হলেও মনেরমত পদ পায় না। অন্তর্নিহিত অর্থে প্রবাদটিতে রাঁধুনি বলতে গৃহ কর্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

ঠিদারের খাটলি / ধুড়ুক ধুড়ুক দৌড়ালি। (গুপী বাউরি, বয়স-৫৫, পেশা-কুলি মজুর, ঝাঁটিপাহাড়ী বাসস্ট্যান্ড, ব্লক-ছাতনা)

ছাতনা বা পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষেরা ক্ষেত-মজুরের কাজ ছাড়াও কুলি-মজুর বা ঠিকা-মজুরের কাজ করে থাকে। সহায়ক বা সাহায্যকারী যে কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত কাজ, রাজমিস্ত্রির রঙের কাজ বা পেতলের কাজ বা তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত এমন। এইভাবেই তারা নিত্য দিন অন্নের যোগান দেয়। কোন কোন দিন ঠিকা-মজুরের ছোট খাট কাজও জোটে না। তারা একবেলা আহার করে দিন যাপন করে। এই ভাবেই জীবনের সাথে লড়াই করে আস্তে আস্তে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যায়। 'ধুড়ক ধুড়ুক' অর্থাৎ ধীরে ধীরে। গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষের কাছে ঠিকাদার অর্থ বোঝায়, কোনো ছোট কাজের সাহায্যকারী ব্যক্তি অর্থাৎ ঠিকামজুর।

ঘুরে বার বসে বার বুলে বার / তার মইধ্যে তুমি যত কত্তে পার। (গুপী বাউরি, বয়স-৫৫, পেশা-কুলি মজুর, ঝাঁটিপাহাড়ী, বাসস্ট্যান্ড, ব্লক-ছাতনা)

এখানে শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষেরা কর্মঠ শক্তির দ্বারা অর্থ উপার্জন করে থাকে। কুলি-মজুর, ঠিকা-মজুরকে ঘরে-বাইরে সমান হস্তে কাজ চালাতে হয়। যে যত পরিশ্রম করে সে তত উপার্জন করতে পারে। গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা চাষবাস ছাড়াও ভাগচাষ, কুলি-মজুর, ঠিকা-মজুর করে দিনযাপন করে থাকে। ঘুরে, বসে, চলে, শ্রমিকদের অন্নসংস্থানের জোগাড় করতে হয়।

এমনি কথার ফন্দি / না হলার ভিতর মাচ নাইক / ঝলাট্যা রইল বন্দি। (তৃপ্তি উপাধ্যায়, বয়স-৫০, নিরক্ষর, পেশা-স্কুলের রান্না করা, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

ছোট পুকুরে 'হলা' নিয়ে মাছ ধরার কৌশলের কথা বলা হয়েছে। কখনো নিজের খাওয়ার জন্য কখনো বা উপার্জনের জন্য এই কাজ গৃহের নারীরাই করে থাকে। 'হলা' হল বাঁশের তৈরী জাল যার সাহায্যে মাছ কে বন্দি করা যায়। অন্তর্নিহিত অর্থে প্রবাদটিতে অতিরিক্ত বক বক করা নারীকে বোঝানো হয়েছে। যার কাজে কিছু নাই কথাই বেশি ।

ময়রা যখন ভিয়েন করে / ছাগনি দিয়ে ছাঁকে / ভুয়েতে রস পড়ে টস টস।(মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, বিধবা, শ্যামবাজার, মাইতকার্ত্তিক পাড়া, ব্লক-সোনামুখী)

মিষ্টি বিক্রেতা, গ্রাম গঞ্জের ছোট দোকানদার ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করে। প্রবাদটিতে রস তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ময়রা জ্বাল দিয়ে কড়া পাকের (ভিয়েন) রস তৈরি করার সময় রস ফুটে উপরের সাদা আস্তরণের সৃষ্টি করে। ছেঁকে নেওয়ার সময় ছাকনি থেকে রস ভুঁয়েতে বা মাটিতে পড়ে। প্রবাদটি দিদিমা তার নববিবাহিতা নাতনিকে উদ্দেশ্যে করে বলেছে। অন্তর্নিহিত অর্থটি হল ময়রার ভূমিকা পালন করেছে নাতজামাই। প্রকৃতির নিয়মে দুই শরীর ও আত্মার মিলন হয়েছে, ময়রা ও রসের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

আগে আখঝাড়টা দিলে / এখন গুড়পাইটা দিতে হতনাই। (বেলা ভুঁইয়া, বয়স-৬৯, নিরক্ষর, গোয়ালাপাড়া, বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের, ৭২২২০৭)

আখ চাষের কথা বলা হয়েছে। আখের রস থেকে গুড় তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে চাষিরা। এখানে অন্তর্নিহিত অর্থ হল কোন কাজ সহজ সরল ভাবে না করে জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। আখের ঝাড় দিলে বা বিক্রিকরলে আর গুড় তৈরী করার জন্য দীর্ঘ দিন (সময়,পরিশ্রম ও প্রক্রিয়ার) অপেক্ষা করতে হত না।

আস্তে গাড়ি যেতে গাড়ি / স্বামী আমার গাছ ব্যাপারী। (পূর্ণিমা ভুঁইয়া, বয়স-৭০, নিরক্ষর, গোয়ালাপাড়া, বনবীরসিংহ, ব্লক-পাত্রসায়ের, ৭২২২০৭)

গাছ ব্যবসায়ীর কথা ফুটে উঠেছে প্রবাদে। গ্রাম গঞ্জের উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের গাছ ব্যবসায়ীর কথা এসেছে। আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারে গর্বিতা স্ত্রী, তার স্বামীর জীবিকার পরিচয় দিয়েছে। তৎকালীন সমাজের স্বচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থার কথাটিও ফুটে উঠেছে।

জানে নাই সান্দা ধরত্যে / উঠ্যে গেছ্যে বাঁশ কাটত্যে। (প্রতিমা বাজ, বয়স-৫৫, নিরক্ষর, গৃহবধূ, খাটুল, ব্লক-জয়পুর)

বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম বাংলায় যত্রতত্র বাঁশ ঝাড় লক্ষ্য করা যায়। সানদা দিয়ে বাঁশ কাটা খুব কষ্টের কারণ বাঁশের কঞ্চি বা ঝাড়গুলি ঘন হয়ে থাকে। সানদা বা কাটারি দিয়ে অতি সর্তক ও সযত্নে বাঁশ কাটাতে হয়। একমাত্র প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজ হয়। কিন্তু যে সানদা ধরতেই জানে না সে অগ্রপশ্চাত না ভেবে কাজ করে। প্রবাদে সেই নির্বোধ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।

গিটকে গিট রয়ে গেল / মাকুটি গলে গেল। (রাধে রজক, বয়স-৬৩, পেশা-তাঁতি, জাতি-ধোপা, বোষ্টমপাড়া, ব্লক-বিষ্ণুপুর)

চতুর ব্যক্তিরা সমাজের নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েও অনায়াসে চালাকির দ্বারা বেরিয়ে আসে। প্রবাদে তাঁত বোনার পদ্ধতিটি আলোচনা করা হয়েছে। তাঁত, বেনারসি, স্বর্ণচুরি, বালুচরি শাড়ি তৈরীর শ্রমটিকে বা পদ্ধতিটিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাঠের তৈরী ছোট যন্ত্র মাকুটি, সুতোয় ভর্তি থাকে। সেই মাকুটি গিট দিয়ে আর্থাৎ সুতোর মারপ্যাঁচে বিভিন্ন নক্সা তৈরী করা হয়। এখানে মাকুটির তাৎপর্য হল মাকুর দ্বারাই শাড়িতে বিভিন্ন রং এর নক্সা বানানো হয়।

লালায় লালায় জল যাচ্ছে / চিংড়ি মাছে কুক দিচ্ছে। (সুমিত্রা দাস, বয়স-৪৯,সুন্দরী দাস মণ্ডল, নিরক্ষর, গ্রাম-মণ্ডলকুলী, মণ্ডলপাড়া, ব্লক-রায়পুর)

লালা অর্থাৎ ছোট নানা বা ড্রেন। গ্রামে গঞ্জে পুকুরের জল ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নালার মাধ্যমে। চাষের জমিতে জল নালায় নালায় বেয়ে যেত। পুকুরের চাষকরা চিংড়ি মাছও নালায় বেয়ে আসাত। প্রবাদটিতে মাছ চাষ এর কথা বলা হয়েছে।

প্রবাদে লিঙ্গ বৈষম্য

সামাজিক পরিকাঠামোর অপর এক অঙ্গ হললিঙ্গ। গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলে গৃহস্থ মেয়েদের ভাষা ও পুরুষদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তা বিভিন্ন কথা বার্তায় স্পষ্ট হয়। সমাজে নারীর অবস্থান ঘরের ভেতরে তারা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানে না বা জানতেও চায় না। তাই নারীরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ তারা সমাজের গৃহস্থালির কাজ নিয়েই প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অসূর্যম্পশ্যা কারণ তারা পরমুখাপেক্ষী, অশিক্ষিত, উর্পাজনে অক্ষম অন্যের উপর নির্ভরশীল। বিবাহের পূর্বে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত থাকে। বিবাহ পরবর্তী স্বামী সন্তানের উপর নির্ভরশীল থাকে। এর জন্য পুরুষ দায়ী নয়, নারী নিজেই। কারণ,নারীরাই তা মাথা পেতে নিয়েছে স্বামীর কাছে বা পিতার কাছে সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছে। তবে বর্তমানে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা সাবলম্বী হচ্ছে। স্বামী মুক্ত মনে স্ত্রীর উপার্জন মেনে নেয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে গ্রামাঞ্চলগুলিতে গৃহের বাইরে কর্মরতা নারী দেখাও অদৃষ্টের ব্যাপার। শিক্ষিত নারী দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। তারা রান্নাঘরের সমস্ত কাজে ব্যস্ততার সাথে পাড়াপ্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ-হাসি-ঠাট্টা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। নিজ সংসারের প্রতি সুখ শান্তি আনার ঐহ্যিক প্রচেষ্টা নিয়েই দিন যাপন করে থাকে। বস্তুতঃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলা প্রবাদ এবং নারীদের উদ্দেশ্যে বলা প্রবাদগুলি সহজেই শনাক্ত করা যায়। যদিও ভাব প্রকাশের জন্য প্রবাদগুলি নারী মনের ফল্গুধারা। ভালবাসা-দুঃখ-প্রেম-প্রীতি-হিংসা-ঝগড়া-বিবাদ এর মধ্য দিয়ে গর্জে ওঠে

কখনো বা গর্বিত কখনো বা লজ্জিত। কখনো বা পুরুষতান্ত্রিত সমাজে প্রবাদই হল নারীর মুখের ভাষা মনের ভাষা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

ব্লকের নাম	মোট গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা	গ্রামের মোট জনসংখ্যা	পুরুষ সংখ্যা	নারী সংখ্যা	শহরের মোট জনসংখ্যা	নারী সংখ্যা	পুরুষ সংখ্যা
শালতোড়া	৭২৮৫৪	৭২৮৫৪	৪৪৮৪৬	২৮০০৮	০	০	০
মেজিয়া	৫০২৪৪	৫০২৪৪	৩০২৯১	১৯৯৫৩	০	০	০

গঙ্গাজলঘাটি	১০৮৬৭৫	১০৮৬৭৫	৬৫৪৫১	৪৩২২৪	০	০	০
ছাতনা	১১২২৬৭	১০৮৫৮৫	৬৫৫৬৮	৪৩০১৭	৩৬৮২	২০৮৩	১৫৯৯
ইন্দপুর	৯২৪৩৪	৯২৪৩৪	৫৬৩০৫	৩৬১৯	০	০	০
বাঁকুড়া-১	৬৫৩৯৫	৬৫৩৯৫	৩৮৫১৩	৬৮৮২	০	০	০
বাঁকুড়া-২	৯১৯৩৯	৯১৯৩৯	৫৩২৮৩	৩৮০৫৬	০	০	০
বড়জোড়া	১২৮৪৪৩	১০৯৫০৯	৬৪১৫৩	৬৫৩৫৬	১৮৯৩৪	১০৩৯৮	৮৫৩৬৫
সোনামুখী	৯২৫০০	৯২৫০০	৫৪১০৭	৩৮৩৯৩	০	০	০
পাত্রসাত্রের	১০৫৬২৯	১০৫৬২৯	৬০৭৫৫	৪৪৮৭৪	০	০	০
ইন্দাস	১০৮৪৬৯	১০৮৪৬৯	৬০৯৭২	৪৭৪৯৭	০	০	০
কোতুলপুর	১৩২৭	১২৪৬৭৪	৬৯৫৯৬	৫৫০৭৮	৬৬৫৩	৫৩৩৭	৩১১৬
জয়পুর	১০৩৯৫১	১০৩৯৫১	৫৯০৮৮	৪৪৮৬৩	০	০	০
বিষ্ণুপুর	৯১৩০৯	৯১৩০৯	৫৩০৯৯	৩৮২১০	০	০	০
ওন্দা	১৪৪৬১৮	১৪৪৬১৮	৮৪৫৪৬	৬০০৭২	০	০	০
তালডাংরা	৯২১৬৮	৯২১৬৮	৫৩০০৬	৩৯১৬২	০	০	০
সিমলাপাল	৬৮১৭২	৮১৭৯৮	৪৭৮৯২	৩৩৯০৬	৪৩৭৪	২৪৮০	১৮৯৪
খাতড়া	৭৪৭৭৫	৬৪৮৮২	৩৮৯১৯	২৫৯৬৩	৯৮৯৩	৫৪২৩	৪৪৭০
হীড়বাঁধ	৪৭৩৯৯	৪৭৩৯৯	২৯৪৪৬	১৭৯৫৩	০	০	০
রানিবাঁধ	৭২০৭০	৭২০৭০	৪৩০৭৪	২৮৯৯৬	০	০	০
রাইপুর	১০৮১৮৮	১০৩৪৫৪	৬১০৩৮	৪২৪১৬	৪৭৩৪	২৬০৭	২১২৭
সারেঙ্গা	৭০০৯৬	৭০০৯৬	৪০৪২৭	২৯৬৬৯	০	০	০

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য এবং ২০১১ সালের আদমশুমারি তে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, নারী পুরুষের বৈষম্য ।বিশেষ করে, গ্রামের প্রান্ত অঞ্চল গুলিতে বেশ চোখে পড়ার মতন। এই বৈষম্যের মূল কারণ নারী পুরুষের শিক্ষার ভেদাভেদ। মোট জনসংখ্যার শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চলগুলিতে নারীর জনসংখ্যা বেশ পিছিয়ে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলিতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অনেকাংশ কম। বস্তুতঃ অধিকাংশ প্রবাদগুলি নারী কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর চাপা প্রতিবাদগুলি প্রবাদের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বেশি,

পুরুষতন্ত্র সমাজের প্রভাবে নারীরা অবহেলিত। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া সমাজের চোখে 'পাপ' বলে ধারণা আছে। সমাজ রক্ষার্থে খুব কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বর্তমান সমাজ নারীর উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নারীরা কুসংস্কারের অতল গভীরে নিমজ্জিত। সংগৃহীত প্রবাদে লিঙ্গ বৈষম্যটি বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

ওল গিদারি বিটি / মাটির ঘর আর ভাতার আছে সবারই। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

গিদারি অর্থাৎ আহংকারী নারী। আলোচ্য প্রবাদটিতে দুই জন নারীর কথোপকথন ফুটে উঠেছে। একান্ত কলহ পরায়ণরত নারী কণ্ঠের কলকাকলি তা চিনে নিতে কোথাও ভুল হয় না। স্বামী ও সংসার নিয়ে একজন অহংকারী বিবাহিতা কুলবধূর মাটিতে পা পড়ে না। তা অপর অহংকারী বধূর সুখ শান্তি সহ্য করতে না পেরে বলে ওঠে 'গিদারি বিটি' মাটির বাড়ি এবং স্বামী সবারই থাকে বড় সেটা নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই। প্রবাদটিতে অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও ফুটে উঠেছে।

নিশি লাইগল নাই সরু দাঁত্যে / নিশি রইল আমার সানবান্দান ঘাট্যে। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর,বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি,বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পো-ছাতনা, ব্লক-ছাতনা)

মিশি অর্থাৎ তামুক জাতীয় হিরাকস ইত্যাদি দিয়ে তৈরী মাদক দ্রব্য যা নারীরা ব্যবহার করে থাকে। একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারের চাপে দু-দণ্ড ঘাটে বসে গল্প করার ফুরসৎ পায় না নারীরা। ঘাটে গিয়ে একসঙ্গে মিলে বাসন মাজা-স্নান করার সময় মাজন বা হিরাকস দাঁতে লাগায়। তাই সেই সমস্ত নারীরা সংসারের জাঁতা কলে পড়ে ক্ষোভের সাথে বলে ওঠে দাঁতে মিশি লাগানোর মতো সময় পাওয়া দুরের কথা, সংসারের চাপে শানবাধাঁনো ঘাটে মিশি ফেলেই চলে এসেছে। আলোচ্য প্রবাদটি একান্ত নারী মনের কথা যা নারীদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে।

মদ খালি হেথা সেথ্যা / গামছ্যা হারালি কুথ্যা / গামছ্যা হারালি সেত লালাত্যে। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

সেত লালা হল 'সরু নালা'। রোজকার জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে আলোচ্য প্রবাদটিতে। নিত্যদিনের ঘটনাচক্রে, স্বামী নেশা ভান করে, তার উপর বহু কষ্টের গামছা খুয়িয়েছে। সেত লালা অর্থাৎ সরু নালাতে গামছা হারানো অসম্ভব। তাই মাতাল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ক্ষেদোক্তি। স্বামীর

এখানে ওখানে মদ খাওয়া মেনে নিলেও দরিদ্র পরিবারে বহু কষ্টের কেনা জিনিসটা হারানো মেনে নিতে পারে না। তাই স্বামীর প্রতি তীক্ষ ঝাঁজালো প্রবাদটি উচ্চারিত হয়েছে।

গন্ডগল না খুঁজে পাই / ভাইঙ্গা কলসি নিয়ে ঘাটকে যায়। (বন্দনা চন্দ, বয়স-৬০, নিরক্ষর, বাউরিপাড়া, কেঞ্জাকুড়া, বাঁকুড়া-১)

একজন নারী অপর একজন কলহ প্রিয়া নারীকে বলেছে। গ্রামের সমস্ত নারীদের মিলন স্থল হল ঘাট। এই ঘাটেই পরচর্চা ও পরনিন্দার আসর স্থান। ঘাটে কলহ-হাসি-কান্না-ঠাট্টা সবই হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রাণের কথা ও মনের কথা বলার নিরাপদ স্থান বলে মনে করে। তাই নারীরা প্রয়োজন ছাড়াও অপ্রয়োজনেও 'ভাঙ্গা কলসি' নিয়ে ঘাটে ছোটে।

চুল লিয়্যেঁ কি বিছাই শুব্য / রূপ লিয়্যেঁ কিধুয়ে খাব্যঁ। (গুপী বাউরি, বয়স-৫৫, পেশা-কুলি মজুর, ঝাঁটিপাহাড়ী বাসস্ট্যান্ড, ব্লক-ছাতনা)

আলোচ্য প্রবাদটিতে উল্লেখিত হয়েছে রূপের থেকে গুনের কদর বেশি। একজন পুত্রবধূর নিকট রূপের থেকে গুণের আশা করে থাকে। পরিবারের সকলে বিবাহের পূর্বে রূপের কদরে ন্যায্য মূল্যে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে আসলেও বিবাহ পরবর্তী, গুণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রবাদটি সংসারের চাপে নিরুপায় রূপবতী বধূর কাছে শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

শাশুড়ি ননদে কয় / ডালে ডাঁটা দিল্যে ভাল্য হয় / আমি যে গরীরের ঝি / আমি শাগে পঁটা দিয়েছি। (বনলতা সু,বয়স ৮০ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প,জাতি-তাঁতি,বীরসিংহ, নতুনগ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

গরীব বাড়ির মেয়ে হঠাৎ করে বড়লোকের বাড়ির বধূ হলে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়। গরীব পিতা মাতার কন্যা জানে কিভাবে অল্প আয়ে সংসার চালাতে হয় ।বাপের বাড়ীতে সামান্য রুজি রোজগারে দু-বেলা আহার করত। সামান্য পদের আয়োজন করে, শাকান্ন দিয়েই আহার করতে হত। কখনো বা সখ-আহ্লাদে শাকের সাথে মাছের পঁটা দিয়ে রান্না করত। তাই নববিবাহিত গরীব বাড়ীর মেয়ে শিখে আসা পদই শ্বশুরবাড়িতে রান্না করে। কিন্তু বিলাস বহুল বড়লোক পরিবারে শাশুড়ির ইচ্ছে ডালে ডাটা দিয়ে রান্না করলে পদ আরো সুস্বাদু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ শাশুড়ির বলার ইচ্ছে বাপের বাড়ি থেকে কিছুই শিখে আসেনি। শাশুড়ি-ননদের গঞ্জনায় তিতি বিরক্ত হয়ে নারী গর্জে ওঠে। পঁটা অর্থাৎ মাছের তেল।

ভাল করতে চাই গ মনে / মন্দ হয় আমার কপাল গুনে। (বনলতা সু, বয়স ৮০ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, বীরসিংহ, নতুনগ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ক্ষমতা নিয়েই নারীকে ভূমিষ্ট হতে হয়। সমাজ-সংসারে সুখ-শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব বহন করতে হয় নারীকে। মন্দগুলি পরিত্যাগ করে সমস্ত ভাল গুলিকে নির্বাচন করতে হয় সংসারের সমৃদ্ধির জন্য। কখনো কখনো নিষ্ঠুর সমাজের পরিস্থিতিতে সমাজ-সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হলে নারীরা তাদের ভাগ্যকেই দায়ী করে, তারা আপন কপালকেই দোষারোপ করে।

কাঁচের চুড়িহি লখ পালিশ / লাল রঙের টিকপাতা / পায়ের তড়া ফুলমতেল / আর দিব্যেক জরির ফিতা।(সুদর্শন সেনগুপ্ত,বয়স-৬২,পেশায়-হোমিওডাক্তার (প্রাকটিস), উচ্চমাধ্যমিক পাশ, গোপালপুর, মালিয়ান, ব্লক-হীড়বাঁধ)

নারীর সাজ-সজ্জার কথা আছে প্রবাদটিতে। পূজা-পার্বনে গ্রাম্য রমনী তার স্বামী বা পিতার কাছে পেয়ে থাকে কাঁচের চুড়ি, নেলপলিশ, লাল-টিপপাতা, পায়ের নুপুর এবং মাথায় সুগন্ধী তেল (ফুলমতেল)। পোশাক-প্রসাধনের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক নারীর এক সুপ্ত ইচ্ছে। তাই স্বামী বা পিতার কাছে স্নেহ ভালবাসার প্রতীক হিসাবে প্রসাধন সামগ্রিগুলি কামনা করে এবং পেয়েও থাকে।

খাচ্চ বিড়ি উড়চে ধুঁয়া / বসে আছে ছুঁচা মুয়া। (সুখেন মণ্ডল, বয়স-৫৫, অষ্টম শ্রেণী, গয়লাপাড়া, মণ্ডলকুলী, ব্লক-রায়পুর)

অর্কমন্য বেকার স্বামীর কথা বলা হয়েছে আলোচ্য প্রবাদটিতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসারে অর্জিত উপার্জন পুরুষেরাই করে থাকে। স্বামী কর্মঠ উপার্জনক্ষম হলে সংসার সুখের হয়,সংসারে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু স্বামী অক্ষম, কুঁড়ে, অকর্মন্য হলে তাকে মন্দ কথাও শুনতে হয়। যারা সংসারের হাল না ধরে কর্মবিমুখ হয়ে আরামে কাটিয়ে দেয় সেই সব অলসপ্রিয় পুরুষ মানুষের প্রতি নিন্দা প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদটিতে।

তুর মতন আমার শাড়ি আছে ল / পরি নাই পরি নাই / সিটা বাস্কই তুলা আছে ল। (অলকা বারিক, বয়স-৫৫, গৃহবধূ, নিরক্ষর, বাকতোড়, ব্লক-তালডাংরা)

উক্তিটি কলহরত দুই নারীর কথোপকথন। একজন নারী অপরজন নারীর উদ্দেশ্যে বলেছে। সংসারে খাওয়া পরা বাসস্থান নিয়ে একজন অপর একজনকে টেক্কা দিয়ে উপরে উঠতে চাই। উভয়ের

পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ। কলহ প্রিয়া নারীরা সামান্য একটা শাড়িকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

লাগিস না লেগ্যে যাব্য / শিয়াকুলে বাদাড়্যে দুব্য। (অলকা বারিক, বয়স-৫৫, গৃহবধূ, নিরক্ষর, বাকতোড়, ব্লক-তালডাংরা)

কলহপ্রিয়া নারীরা উপরিউক্ত প্রবাদটি অপরজনকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে ঝগড়া করলে শিয়াকুলের কাঁটায় বাদাড়ে দুব। ঝগড়া করলে তার পরিনাম হবে ভয়ঙ্কর। বস্তুতঃ তাকে চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রবাদটিতে। শিয়াকুলের গাছ সর্বাঙ্গ কাঁটা জাতীয় ছোট প্রকৃতির কুল গাছ। বাদাড় অর্থাৎ আঁচড় কাটা।

ভাইত্যে ক্যান্যে ধান / ধান সিজ্যা মাগিকে আন। (নন্দীতা সহিস, বয়স-৫৫,জাতি-হাঁড়ি, সহিসপাড়া, হাতিরামপুর, ব্লক-খাতড়া)

একজনের দোষ ঢাকতে অন্যের উপর দোষারোপ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্বদা 'পান থেকে চুল খসলে' নারীকে দায়ী করে। সমাজের নিয়ম অনুযায়ী ধান রোপন থেকে বপন সমস্ত কাজ পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকে (যদিও নারীরাও পুরুষেদের কাজে হাত লাগায়)। পরবর্তী কাজ ধান ঘরে উঠলে সেই ধান সিজা বা সেদ্ধ করার দায়িত্ব থাকে বাড়ির মহিলাদের উপর। বস্তুতঃ নারীরা মাঠ থেকে ধান তুলে নিজ হস্তে সিদ্ধ করে। এবং 'ধান ভানে' অর্থাৎ ধান থেকে চাল তৈরী করে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় বাড়ির গৃহকর্তার পাতে ভাতের সাথে ধান পাওয়া গেলেই উক্ত প্রবাদটি বলে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ নারী ভেদাভেদের বাস্তব রূপটি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে।

খাইচ্চ এলাচ লঙ দিয়ে পান / সে কি ভাইঙ্গব্যেক আমার ধান । (মিতালি ঘোষ, বয়স-৩২, স্নাতক, বহড়ামুড়ি, হরিমন্দির প্রাঙ্গণ, ব্লক-খাতড়া)

অকর্মন্য কোন নারীকে বলা হয়েছে। একজন নারীর উদ্দেশ্যেই এই প্রবাদটি আলোচিত। পিতা-মাতার নিকট, তাদের কন্যা রাজকন্যার সমান। পিতা আদর দিয়ে সযত্নে বড় করেছে। পরিবারে মেয়েকে কুটোটি নাড়তে দেয় না। ধান ভাঙ্গতে জানে না কারণ পিতার স্নেহে রাজকন্যার মতোই এলাচ লবঙ্গ দিয়ে পান খেয়ে হেসেখেলে জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর সংসারের চাপে মেয়ে শাশুড়ির গঞ্জনায় তিক্ত হয়ে ওঠে। শাশুড়ি গর্জে ওঠে বলে, 'সে কি ভাইঙ্গব্যেক আমার ধান'।

ভুলি নাই তুর রূপ দেইখ্যে / ভুলেচি তুর চুল ভাইঙ্গা দেইখ্যে। (পোস্ত ঘোষ, বয়স-৬০, নিরক্ষর, মচড়াকেন্দ, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া, ৭২২১৪৩)

প্রবাদটি একজন নারীর কাণ্ঠে পাওয়া, একজন প্রেমিক পুরুষের উদ্দেশ্যে বলেছে। "চুল ভাইঙ্গা" অর্থাৎ সৌখিন চুল বা টেরিকাটা বা চুলের সৌন্দর্য। প্রেমালাপের সময় একজন সাহসী স্পষ্টবাদী নারী প্রেমিক পুরুষকে কৌতুকের সুরে বলেছে।

লারি না পারি কথায় ক্যান্যে হারি। (ভানুমাতি কালিন্দী, বয়স-৬০, সুধীর কালিন্দী, বয়স-৭৫, পোঃ কেঞ্জাকুড়া, ব্লক-বাঁকুড়া-১)

পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি কথা বলে। আলোচ্য প্রবাদটি নারীর উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। তর্ক-বির্তকে জয় পরাজয়ের প্রসঙ্গে। কাজে না হোক কথায় কেউ হারাতে পারে না নারীকে।

জল দিল্যে হয় ক্যাল্য / কুইলা ছুঁড়িকে কে বল্যে ভ্যাল্য। (কশ্বুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি, বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পো-ছাতনা, ব্লক-ছাতনা)

নিষ্ঠুর সমাজে কালো বর্ণের নারীরা মর্যাদা পাই না। কয়লাকে জল দিয়ে ধুলেও যেমন পরিষ্কার হয় না তেমনি তার কালো রঙের মেয়ে সমাজের সম্মান পায় না। তখন নারীর রূপের সাথে সাথে গুন ও পরিত্যজ্য হয়। নিষ্ঠুর সমাজে কালো নারীর মর্যাদা নেই। যতই গুন থাক না কেন কালো মেয়ের কদর কম। কুইলা আর্থাৎ কালো বা কয়লার মতো রং।

মাথায় রাখল্যে ইকুনে খাই / ভুঁয়্যে রাখল্যে পিমড়াই খায় / পানা পুখুরের ঠান্ডা জল বড়ই মন্দকারি। (লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তী, বয়স-৭৫, স্বাক্ষর, গ্রাম+পো-মাকড়কোল, গোয়ালা পাড়া, ব্লক-ওন্দা)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন কড়া স্বামী তার স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছে। পানাপুকুরের ঠান্ডা, মন্দ জলের সমান একজন অনাদৃতা নারীর কথা ফুটে উছেছে। মন্দ কোথাও ঠাঁই হয় না, না মাথায় না মাটিতে। তারা সমাজে সর্বদা অবহেলিত। প্রবাদটি কখনো কখনো শাশুড়ির মুখে শোনা যায়।

পর ভাইলনা / ঘর জ্বাইলনা। (রীতা ব্যানার্জ্জী, বয়স-৫৫, গ্রাম+পো-মাকড়কোল, গোয়ালা পাড়া, ব্লক-ওন্দা)

যে নারী নিজ স্বামী-সংসার কে না ভালবেসে পরপুরুষকে আপন করে নেয়। সেই সব নারীর উদ্দেশ্যে প্রবাদটি আলোচিত। রূপে ও কথার মোড়কে পরপুরুষের মন জয় করে নেয় সহজেই। সেই সব মেয়ে নিজ স্বামী সংসারকে সহ্য করতে পারে না। মন্দ নারীদের ঘর জ্বালানো এবং পুরুষকে ভোলানোর মানসিকতাটি সহজেই প্রকাশ পায় প্রবাদটিতে।

রাত পুহাল্যে হল্য দিন / বদর বদর সারা দিন। (শিবানী ব্যানার্জ্জী, বয়স-৫০, গৃহবধূ, গ্রাম+পো-মাকড়কোল, গোয়ালা পাড়া, ব্লক-ওন্দা)

রাত পুহাল্য অর্থাৎ রাত পার হওয়া। বদর বদর অর্থাৎ বক বক করা বাঁকুড়ার অধিবাসীদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অতিরিক্ত বকবক করা নারীর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। সহজ সরল নারীকে মিষ্টি ভাষার ধমকের সুরে চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছে। সকলে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত সারাক্ষণ বকবক করে নারী। কেবলমাত্র রাত্রে ঘুমানোর সময়টুকু নিস্তার পাওয়া যায় শান্তি পাওয়া যায়। নারী মনের সহজ সরল দিক টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পেঁন্দ্যা মিঞা খুঁজে গোল। (ইলা চক্রবর্তী, বয়স-৬৫, চতুর্থ শ্রেণী, গোয়ালাপাড়া, মাকড়কোল, ব্লক-ওন্দা)

বেশি কথা বলা মেয়েরা সর্বদা ইহ হট্টগোল পছন্দ করে। বেশি কর্থাবর্তা বলা নারীরা সমাজে বেশি গুরুত্ব পায় না। প্রবাদে সেই সব তুচ্ছ নারীদের কথা বলা হয়েছে। পেঁন্দ্যা অর্থাৎ গুরুত্বহীন। গোল অর্থাৎ হই হট্টগোল।

এত কর্য্যে করি ঘর / তবু মিইনস্যে বাস্যে পর। (হীরারানি মণ্ডল, বয়স-৭০, জাতি-শুঁড়ি, নিরক্ষর, বিধবা, পাহাড়পুর, ব্লক-বড়জোড়া)

তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা ছিল পুরুষদের কাছে হেয়। মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেও নারীরা পুরুষদের চরণে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কারণ তারা পরমুখাপেক্ষী ভাতকাপড়ের জন্য স্বামীর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। পরিস্থিতিতে পুরুষের বহুগামিতাকেও সহ্য করতে হয়। সমাজরক্ষার্থে অবহেলিত নারীরা সংসার টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

কুথা যাইচ্ছিস যা সেখান্যে / দেখ্যা হব্যেক ঘুইর‍্যে ঘুইর‍্যে / মদের দোকান্যে। (আদরি বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, বিধবা, মচড়াকেন্দ গ্রাম, পোঃ রামচন্দ্রপুর, ব্লক-মেজিয়া)।

আলোচ্য উক্তিটি একজন পুরুষের উদ্দেশ্যে অপর একজন পুরুষকে বলেছে। নিত্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যে বেলার ঠিকানা হল"মদের ভাটি" ।পুরুষেরা একটু আমোদবিলাসিতায় মত্ত হয়। মদ খেয়ে তাদের দরিদ্র জীবনের কষ্ট লাঘব করতে চাই। এটি একটি গ্রাম্য এলাকার নিত্য দিনের ঘটনা মাত্র।

বউ আমার রান্তে জানে নাই কুলে বেগুনে / ফু দিয়ে মুখ পুড়ে গেলতুষের আগুনে। (দেবদুলাল সু, বয়স-৫০ উর্ধ্বে, পেশা-তাঁত শিল্প, জাতি-তাঁতি, বীরসিংহ, নতুন গ্রাম, ব্লক-পাত্রসায়ের)

শাশুড়ি-বধূর উক্তির। আলোচ্য প্রবাদটিতে শাশুড়ির গঞ্জনা ফুটে উঠেছে। আদরে-আবদারে বেড়ে ওঠা নারীরা বিবাহের পরে সংসারের হাল সামলাতে পারে না। এত বড় গৃহস্ত পরিবারের চাপে নাজেহাল হতে হয়। উনুন ধরানো থেকে শুরু করে রান্না করা, বাসন মাজা, সমস্ত কাজ নববধূর উপর ভার পড়ে। তবুও শাশুড়ির গঞ্জনার সীমা থাকে না। সামান্য কিছু ত্রুটির কারণে শাশুড়ি গর্জে উঠে। ফলে সাধ করে কুলে-বেগুনে রান্নার জন্য বধূর অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয় যখন শাশুড়ি ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে যে বউ আমার রান্তে জানে নাই কুলে বেগুনে / ফু দিয়ে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।

প্রবাদে ধর্মীয় অবস্থান

ধর্মীয় আচার ব্যবস্থা সামাজিক পরিকাঠামোর একটি মূল অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অতীত থেকে বর্তমান কাল অবধি ধর্মের ভূমিকা একটি বিতর্কিত অধ্যায়। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি, সমাজের যাবতীয় ধার্মীয় আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান-ব্যবস্থা-পূজা-অর্চনা-প্রার্থনা-উপাসনা-আরাধনা-শ্রদ্ধা-ভক্তি ইত্যাদি যে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে।

এর সুফলের প্রভাব আশীর্বাদ রূপে ঝরে পড়ে যা সমাজ জীবনে একটা নির্দিষ্ট দিক অর্জন করে। জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। বর্তমান জীবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করলে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি বজায় থাকে এবং একতার মাধ্যমে ঐতিহ্যগত সমাজ-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে ধর্ম। অপরদিকে ধর্মহীন ব্যক্তি সংগ্রামী মনোভাবকে ভেঙে দেয়।

ধর্মহীনতা জীবনকে ভাগ্যের চাকার উপর ছেড়ে দেয় যা সমাজ জীবনে প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ বিতর্কিত জটিলতায় না গিয়ে কিভাবে ধর্ম, সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করছে তার একটি নির্দিষ্ট রূপ তুলে ধরায় চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রবাদে আমরা সমাজ জীবনের উপর ধর্মীয় প্রভাবটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে পারি। কারণ, প্রবাদে ধর্ম ও সমাজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বাঁকুড়া জেলায় লোকদেবতা অসংখ্য, প্রাচীন লোকধর্ম ও লোকদেবতার সাথে সাথে "বার মাসে তেরো পার্ব্বণ" লেগে থাকে। সেই হিন্দু ধর্মের দেব দেবতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত রীতি-নীতি, আচার ব্যবস্থা গুলিকে সুন্দর ভাবে প্রবাদের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে পারি —

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার জাতি গত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান -

বছর	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিস্টান	জৈন	শিখ	বৌদ্ধ	অন্যান্য জাতি	অন্যান্য জাতি নয় এমন	মোট জনসংখ্যা
২০১১	৩০৩৩৫৮১ (৮৪.৩)	২৯০৪৫০ (৮.১)	২৯০৪ (০.১)	৩৮৬৫ (০.১)	২৬০ (০.০)	৩৮৬ (০.০)	২৬০৬৯৪ (৭.২)	৪৫৩৪ (০.১)	৩৫৯৬৬৭৪

২০০১ সালে, আমরা বাঁকুড়ায় অবস্থিত হিন্দুধর্ম সহ অপর ধর্মের পরিসংখ্যান দিকটি দেখানো হয়েছে। বাঁকুড়ায় অবস্থিত অপর ধর্মের মানুষের নিকট প্রবাদ সংগ্রহ করা হয়নি প্রবাদগুলি কেবলমাত্র হিন্দুদের নিকট সংগৃহীত হয়েছে। আমার গবেষণার বিষয় বাঁকুড়ার বাংলা প্রবাদ। তাই বাঙালি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবতাকেন্দ্রিক প্রবাদ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

বড় লকের বাড়ি আর গরীবের হরি। (নান্টু সূত্রধর, বয়স-৩৭, উচ্চমাধ্যমিক, পেশা-কাঠের কাজ, পোঃ বিষ্ণুপুর, বাহাদুর গঞ্জ, ব্লক-বিষ্ণুপুর)

ধনী মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি-ঐশ্বর্য-বিলাস ভবনে রাজকীয় ভাবে বসবাস করে। কিন্তু দরিদ্র মানুষের 'বাড়ি' তো দূরের কথা মাথার ছাদ বলে কিছু নেই। দরিদ্র মানুষেরা চেষ্টা বা পরিশ্রমের মাধ্যমে নয় ভাগ্যের উপর দোহাই দিয়ে হরির স্মরণাপন্ন হয়। ভালো মন্দ সমস্ত কিছু হরিই সহায়। প্রবাদটিতে ধর্মীয় বিশ্বাসটি গুরুত্ব পেয়েছে।

মাইনল্যে শিব না মাইনল্যে ঢিল। (লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তী, বয়স-৭৫, এম.এ স্বাক্ষর, গ্রাম+পো-মাকড়গ্রাম, গোয়ালা পাড়া, ব্লক - ওন্দা)

মানসিক বিশ্বাসের কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে ভগবানকে। আমাদের সমাজ জীবনের ধর্মীয় প্রভাবটি কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তার একটি রূপ প্রবাদে ফুটে উঠেছে। যারা মানসিকভাবে দুর্বল তাদের কাছে 'ঢিল' হয়ে ওঠে ভগবান। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা সহযোগে ঘটা করে পূজা-পার্বণ করা হয়। আর যারা মানসিক ভাবে শক্তিশালী তাদের কাছে শিবলিঙ্গ পাথর সদৃশ্য। বাঁকুড়া অঞ্চলের মানুষের মুখে 'পাথর' হয়েছে ঢিল।

লবে লবে লবান্ন। (স্বপন কুমার দে, বয়স-৬৩, স্বাক্ষর, পেশা-ব্যবসা, পোঃ বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ, ব্লক-বিষ্ণুপুর)

বাঁকুড়াবাসীর উচ্চারণে নবান্ন হয়েছে লবান্ন। নতুন অন্ন ভোগের নামকরণেই উৎসবের নাম হয় নবান্ন। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান উঠলে, নতুন ধান (গোবিন্দ ভোগ চাল) সহযোগে দুধ, বিভিন্ন মিষ্টি মাখা করে ঠাকুরকে নৈবেদ্য রূপে দেওয়া হয়। এই রকম সুগন্ধী নতুন চালের ভোগ অল্পতে স্বাদ মেটে না। বার বার নবান্ন খাওয়ার লোভ থেকেই যায়। প্রবাদটিতে অন্তর্নিহিত অর্থে বলা হয়েছে, অতি কিছু ভাল না।

রাধা দিল মাড়ুলি / কৃষ্ণ দিল পদধূলি। (মিরা বাউরি, বয়স-৭০, নিরক্ষর, পেশা-ঝি, পাইসাগলি, গ্রাম+পোঃ তিলুড়ি, ব্লক-শালতোড়া, ৭২২২৫৩)

হিন্দু ধর্মের দেবতা রাধা-কৃষ্ণকে রক্ত মাংসে গড়া মানব মানবীকে পরিণত করেছে। প্রবাদের স্বর্গীয় দেবতাকে মর্তের মাটিতে নামিয়ে নর-নারীতে পরিণত করেছে। হিন্দু ধর্মের সংস্কার মতে রাধা ভোর বেলায় গৃহের কল্যাণের জন্য মাড়ুলি দেয় এবং কৃষ্ণের পদধূলি মাথায় নিয়ে সংসার জীবন পালন করে।

বিসনুপুরের ভাদু তুমি খুঁজগ তুমি ঝাড়ের আল। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, বিধবা, পেশা-কাঠকুড়ানি, বাসস্ট্যাণ্ড, ঝাঁটিপাহাড়ী, পোঃছাতনা, ব্লক-ছাতনা)

বিষ্ণুপুরে মাসে ভাদ্র মাসে বিখ্যাত ভাদু পরব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ার সকল গ্রামের লোকেরা বিষ্ণুপুরের ভাদু পরব দেখতে আসত। যদিও প্রত্যেক পরিবারে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাদু পরবে ঝাড়ের আলো ছাড়া অনুষ্ঠানটি অসম্পূর্ণ। ভাদু ভাসানের দিন মিছিল করে ঝাড়ের আলো, রোশনায়,

বাদ্য-সানাই পরিবেশিত হতো। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ঐ দিন লোকে লোকারণ্য হয়। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার যুগে বিষ্ণুপুরে ঝাড়ের আলো সহযোগে প্রাচীন উৎসবটি আর চোখে পড়ে না। যদিও গ্রামে-গঞ্জে এখনও ভাদু পূজা যৎসামান্য আয়োজন করেই পূজা শেষ হয়। ঝাড়ের আলো হল ঝাড়বাতির মতো দেখতে তেলের সলতে সহযোগে আলো জ্বালানো হয়।

উপসংহারে বলা যায় প্রাবদে মধ্য দিয়ে সমাজের আঙ্গিকগত পরিকাঠামোতে বাঁকুড়ার সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনাচরণের কথা প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। অসূর্যম্পস্যা নিরক্ষর নারীরা অসম্পূর্ণ চাওয়া-পাওয়াগুলি প্রতিবাদী কণ্ঠে প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে অন্তঃপুরের মহিলাদের আঁতের কথা উঠে এসেছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী নারী-পুরুষের সংখ্যা, গ্রাম-শহরের সংখ্যা, শিক্ষা-অশিক্ষার হার, পেশাগত ভিন্নতাগুলি শুধুমাত্র তথ্য হিসাবে নথিভুক্ত থাকেনি, ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক মানুষগুলির ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় দিকগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে দৃষ্ট হয়েছে। পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, মাসি-মেসো, পিসি-পিসেমশাই, কাকু-কাকিমা, শ্বশুর-শাশুড়ি, শাশুড়ি-বধূ, পাড়া-প্রতিবেশীর দৈনন্দিন সম্পর্ক, নিত্যদিনের দরিদ্র নিম্ন বর্ণের মানুষের জীবন সংগ্রামের অর্থনৈতিক দিক, দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষগুলির প্রতি ক্ষমতাপ্রবণ, বলশালী, প্রভাবশালী মানুষগুলি রাজনৈতিক প্রভাব, দমিয়ে রাখা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাবে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির চাষ এখানকার প্রধান জীবিকা, ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, সমাজ-সংস্কৃতিগুলিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা মানুষগুলির প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাঁকুড়ার বাংলা প্রবাদের গুরুত্ব চিরস্মরণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. পরিমল ভূষণ কর, 'সমাজ-তত্ত্ব', সপ্তম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-১৩, পাতা-২৬৭।

২. পরিমল ভূষণ কর, 'সমাজ-তত্ত্ব', সপ্তম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-১৩,পাতা-৩৭৫।

৩. Census of India 2011, West Bengal, Series-20, part-XII-A, District census Text Book Bankura, Village and Town Directory.